BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

008 / NOVEMBER 2015

অরুণেশ ঘোষ
কবিতার অন্ধকার যাত্রা

কভার ফটো: কিউ

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

অগ্রহায়ণ ১৪২২ ● নভেম্বর ২০১৫

অরুণেশ ঘোষ (জন্ম- ২৯ শে ডিসেম্বর ১৯৪১, মৃত্যু-২৪শে আগস্ট ২০১১
বাংলা সাহিত্যের একজন কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ও অনুবাদক। ১৯৬৫ সালে কয়েকজন অন্দোলনকারী (অর্থাৎ শৈলেশ্বর ঘোষ এবং সুভাষ ঘোষ) হাংরি মামলায় যখন রাজসাক্ষী হয়ে যান, আন্দোলনটি ভেঙে গিয়েছিল। সাত দশকের মাঝামাঝি অরুণেশ ঘোষ তাঁর 'জিরাফ' পত্রিকার মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনকে পুনরায় জীবিত করে তোলার চেষ্টা করেন। এতো প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা সত্ত্বেও অরুণেশ 'দেশ' পত্রিকাতেও লিখেছেন।
তিনি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা গ্রামে বসবাস করতেন, উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সারাজীবন নিজের গ্রামে বুনিয়াদি স্কুল শিক্ষক ছিলেন। গ্রাম ছেড়ে যেতে চাননি কলকাতায়। তিনি বিশিষ্ট সাঁতারু ছিলেন কিন্তু তা সত্বেও পুকুরে স্নান করার সময়ে জলে ডুবে মারা যান। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নও ওঠে। অরুণেশ ছিলেন সাতের দশকের বাংলা কাউন্টারকালচার সাহিত্যের আ ফাঁ তেরিবল।

২. কবিতার অন্ধকার যাত্রা অরুণেশ ঘোষ

কবিতার অন্ধকার যাত্রা

অরুণেশ ঘোষ

কবিতীর্থ
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩

KABITAR ANDHAKAR YATRA
A colleciton of Essay by
ARUNESH GHOSH
কবিতার অন্ধকার যাত্রা ❑ অরুণেশ ঘোষ ❑ কবিতীর্থ

ISBN 81-86566-70-8

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৪, মাঘ ১৪১০

প্রকাশক
উৎপল ভট্টাচার্য
কবিতীর্থ ❑ ৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি
কলকাতা-৭০০০২৩

বর্ণবিন্যাস
রাম লেজার
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

মুদ্রণ
সুকান্ত ঘোষ ❑ নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কল-৬

বিনিময়
ষাট টাকা

সূচী

অন্যান্য বই :

শব ও সন্ন্যাসী
অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা
গুহা মানুষের গান
মাতাল তরণী
জীবনানন্দ
জীবনের জার্নাল
বর্বরের তীর্থযাত্রা
সন্তদের রাত
কাল কবীরের দোঁহা

উৎসর্গ

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের

'কবিতার অন্ধকার যাত্রা' অরুণেশ ঘোষের নতুন প্রবন্ধগ্রন্থ। না, ঠিক প্রথাগত প্রবন্ধ নয়—একজন সৃষ্টিশীল লেখকের আত্মকথা মেশানো কিছু ভাষ্য, কিছু শব্দবিন্যাস। যা আমাদের পাঠকদের কাছে এক দুর্লভ প্রাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বলা যায়, একাডেমিক মূর্খতা, ইন্টেলেকচুয়াল ভণ্ডামি, বৈপ্লবিক বুলি, বিদ্বেষপরায়ণ সাহিত্য-উদ্‌গার আর উদ্ধৃতি-কণ্টকিত-বাক্যজাল থেকে মুক্তি পাবেন তাঁরা। এতে সমাহিত হয়েছে বারোটি বিশ্বমানের রচনা যা নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০০৪

উৎপল ভট্টাচার্য

কবিতার অন্ধকার যাত্রা

......

অজস্র কবিতা লেখা ছাপা হয়ে ঝরে যায়। সংখ্যাহীন কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে পাঁচ-দশ জনের হাত ঘুরে হারিয়ে যায়। যারা বেশি প্রচারিত, পুরস্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত, তারাও তাদের কলমে কালি শুকিয়ে আসার আগেই ঝরে যায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, সময় থেকে সময়ে তাদের কবিতা প্রবাহিত হতে পারে না। মিথ্যা গর্ব বেশিদূর প্রসারিত হতে পারে না। ঝরে গিয়ে, মুছে গিয়ে শূন্যতা ফুটে ওঠে, ফাঁকা সময়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বহুদূর অবধি, দেখা যায় সেই শূন্যতায় দাঁড়িয়ে আছেন দু-একজন পূর্ববর্তী কবি, যার বা যাদের প্রভাব দূরপ্রসারী। জীবনানন্দের পর ঠিক কোন্ জায়গা থেকে কোথা থেকে শুরু করতে হবে নতুন কবিতা সেটা বুঝতেই পরবর্তী বাংলা কবিতার অনেকটা সময় লেগে গেল। বিনয় মজুমদার বিনম্র ভঙ্গিতে গ্রহণ করলেন জীবনানন্দীয় বোধ, ভাষায় হলেন ধ্রুপদি, কবিতাকে টেনে আনলেন আরও কাছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে আবিশ্ব-জগতের এক মিশ্রণ ঘটল তাঁর কবিতায়। কবিতার শরীর ও গঠনশৈলী তাঁর, মধুসূদনকে মনে পড়িয়ে দেয়। 'ফিরে এসো চাকা'র কবিতা স্রোতের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হতে দেখা যায় মধুসূদনের দূর আত্মবিলাপের মৃদু শব্দও। কিন্তু বিনয় এইভাবে বহন করলেন না শেষ পর্যন্ত, ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তবুও বিনয় মজুমদার জীবনানন্দের পরে আরও একটি ধাপ, অন্য যাঁরা, তাঁর সহযাত্রী, তাঁরা এর মধ্যেই নিশ্চিহ্ন প্রায়। বাংলা কবিতা জীবনানন্দের পর অসুস্থ উন্মাদ বিনয়কে গ্রহণ করেছে, সে সময়ের অন্য কাউকে নয়।

বাংলা কবিতা যখন রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই তাঁর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে, সে সময়ের জটিলতার থেকে আজকের জটিলতা আরও বেশি মনে হয়। মনে হয়, আজ আরও বেশি অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন, ঠিক তা নয়। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মনোমতন এক আধুনিক বাংলা কবিতা, বাংলা সাহিত্য। সুধীন্দ্রনাথে তাঁর আপত্তি ছিল না, ছিল না বিষ্ণু-দের 'সমাজ সচেতন' আধুনিকতায়। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতা, তাঁর মানসিকতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। না, কবিতায় আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হল না। ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বাংলা কবিতা নতুন দিকে বাঁক নিল। এক নতুন বিশ্ব পেলাম আমরা, আধুনিক পাঠক যেন এই ভাষা, এই চেতনা ও চিন্তাস্রোতের অপেক্ষায় ছিল। যদিও সে পাঠকগোষ্ঠী ছিল আকারে

ছোট, যে-কোনো ভাষার নতুন লেখালেখির শুরুতে যেমন হয়। কিন্তু সেই পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল ভবিষ্যতের কবি, লেখক ও শিল্পীরা, ছিল বিশাল পাঠকসমাজের ভ্রূণ। জীবনানন্দকে অপেক্ষা করতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত—তাঁর পাঠকের রক্তে মাংসে মেধায় প্রবেশ করতে। জীবনানন্দ পড়ার পর রবীন্দ্রনাথে আর ফেরা যায় না, সময় ও ভাষার এক বিশাল তফাত ঘটে গেল। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যাঁরা ছিলেন জীবনানন্দের সহযাত্রী, সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও সমর সেন—তাঁদের নেতি ও ইতির মধ্যেও আজকের একজন কবির, একজন পাঠকের প্রেরণা পাওয়ার কিছু নেই। আমরা পড়ে দেখতে পারি কিন্তু উদ্দীপ্ত, ভাবিত ও আলোড়িত হতে পারি না। যেমন হতে পারি জীবনানন্দে। জীবনানন্দ দূর অতীত থেকে বহুদূর বিস্তৃত ভবিষ্যৎ অবধি একটা সময়কে তাঁর নিজের সময়ের গন্ধ স্পর্শ রসে জারিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

আজ আবার বাংলা কবিতা জীবনানন্দীয় গভীর গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাঁর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে যে বিশৃঙ্খলা, এলোপাথাড়ি ও উন্মাদক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতা ও উপনিষদীয় চেতনাকে যতটা সহজে অতিক্রম করা হয়েছে, জীবনানন্দের হৃদয়বৃত্তি, প্রজ্ঞা ও নতুন বিশ্ববোধকে অতিক্রম করা ততটা সহজসাধ্য নয়। অভিজ্ঞতায় তাই মনে হচ্ছে। কেউ ছন্দে ভরিয়ে তুলতে চায় শূন্য প্রেক্ষাপট, কেউ বিদ্রোহ বা প্রতিবাদে, কেউ আত্মসমর্পণ করতে চায় আবার রবীন্দ্রনাথে। অথবা কেউ, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যর্থতার পরও আবার লিখতে চায় 'সমাজ সচেতন' কবিতা। কিন্তু এসব কিছুতেই তাঁকে জীবনানন্দকে অতিক্রম করা যায় না, যাবে না।

সমসাময়িক ভাসমান ঘটনাগুলোকে অনেকের কাছে চূড়ান্ত বলে মনে হয়। বিশৃঙ্খল ঘটনাপ্রবাহের নীচে, উপরিতলের উল্লাস ঘৃণা বিদ্বেষ আঘাত প্রত্যাঘাত সফলতা নিষ্ফলতা আর মরণপণ প্রতিযোগিতার নীচে নীচে থাকে আরও এক অন্তর্লীন স্রোত। স্রষ্টাকে তা বুঝতে হয়, সেই অন্তর্স্রোতকে ধরতে হয়, তুলে আনতে হয় ভাষায়। ডস্টয়েভস্কির সময়ের রুশ দেশ ও রুশ সাহিত্য, কাফ্‌কার সময়ের ইউরোপ ও ইউরোপীয় সাহিত্য এবং জীবনানন্দের সময়ের আমাদের দেশ ও আমাদের সাহিত্য—এই শতাব্দী শেষের ভূমিখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাই। জীবন ও প্রতিভার গূঢ় অন্ধকার সবার কাছে স্পষ্ট হওয়ার নয়। শুধু এমন একটা শিহরণ জেগে ওঠে এক-একটা সময়ে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে যায়। ডস্টয়েভস্কির চেয়ে টলস্টয়ের উৎকর্ষতা ও মহত্ত্ব কাফকার চেয়ে টমাস মানের যথার্থতা আর সমাজবাদী ধ্যান-ধারণার সপক্ষে ক্ষয়িত জীবনকে তুলে ধরে নতুন সমাজজীবনে জায়গা করে দেওয়ার জন্য পূর্বস্তম্ভ হিসেবে অভিনন্দিত এবং জীবনানন্দকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যক্কারজনক আক্রমণ, আমাদের চোখ ফেরাতে চেয়েছে অনেকবার। তবুও আধুনিক মানুষের কাছে, নতুন সময়ের নতুন মানুষের কাছে ডস্টয়েভস্কি, কাফকা ও জীবনানন্দ হয়ে আছেন দূর ভবিষ্যৎ অবধি প্রসারিত এক একটি উজ্জ্বল

প্রেরণাদাত্রী প্রতিভা।

একটা সত্য এখনও সাধারণের কাছে উন্মোচিত হয়নি, সেটা হল প্রায় পঁচিশ বছর আগে থেকেই বাংলা কবিতা জীবনানন্দ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে চলেছে। তাঁর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে, তাঁকে পূর্বসূরি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তাঁর কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদের এই সময়ের জীবনবোধ। এটা ঘটছে এক বিশৃঙ্খল ও অন্ধকার অবস্থার মধ্যে। যাঁরা তাঁদের নিজের সময়কে দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরতে পারেন। যাঁরা অস্বীকার করেন প্রথাগত ও মৃত চিন্তাভাবনাকে, যাঁরা পশ্চাতের বহমান ও জীবন্ত ধারাগুলোকেই স্বীকার করেন, পচে হেজে যাওয়াগুলোকে নয়। তাদের প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয়। কিন্তু তাতে আসে যায় না, তারা তাদের পথ চলা থামায়নি। রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্য-কোলাহলের মধ্যে কারুর মনে ছিল না জীবনানন্দের কথা, দৃষ্টি ছিল না তাঁর দিকে। যেমন ভেঙে পড়া রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় কারুর চোখ থাকে না পতিত অবহেলিত নীচের তলার মানুষগুলোর দিকে। রাজপুরুষেরা, আমলারা, সেনাপতিমশাই ও সৈন্যধ্যক্ষরা, অভিজাত শ্রেণী ও বণিকেরা আর সুবিধাভোগী মধ্যস্তরের কোনো মানুষই ভাবতে পারে না। নীচের তলা থেকে বিশেষ কেউ একজন এসে ক্ষমতা দখল করে নেবে। হয়েছেও তাই। জীবনানন্দ ছিলেন ওদের সমস্ত হিসেবের বাইরে, অভিজাত কবিকলরবের থেকে অনেক দূরে এক বৈপ্লবিক প্রতিভা। বাংলা ভাষায় এক বিপ্লব ঘটে গেল, নিঃশব্দে।

বিপ্লব ঘটে গেলেও, পরবর্তী সময়ে, ১৯৫০-এর দিকে এই বৈপ্লবিক বোধকে এড়িয়ে যাবার, তাকে চাপা দিয়ে তার ওপর এক প্রেতনৃত্য করার প্রেরণা হঠাৎ কিছু বাঙালি কবি কোথা থেকে পেলেন, সেটা আজ গবেষণার বিষয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়রা কি ভেবেছিলেন জীবনানন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন কৃত্রিম ভাষার সস্তা লিরিক-জোয়ারে? কোনো কোনো সময়ের বাঁকে কবিতা যদি আপনা থেকেই সহজ হয়ে উঠতে চায়। তাতে দোষের কী, কিন্তু তা যদি সস্তা করা হয়, সস্তা পণ্যদ্রব্য তাহলে ঘৃণার কারণ হয়। ক্ষুধার্ত প্রজন্ম তীব্রভাবে এই অসাড় কাব্য উচ্ছ্বাসকে আঘাত করেছিল। ৫০-এর কবি হিসাবে তারা অস্বস্তির কারণও হয়েছিল। তবুও ৫০-এর প্রতিষ্ঠাতারা ভেবেছিল, এই শ্লোগান, চিৎকার ও শিল্পহীনতা জীবনানন্দ পরবর্তী কবিতায় কোনো ছাপ ফেলতে পারবে না। বাংলা কবিতায় এদের কোনো স্থান হবে না। কিছুটা ঠিক ভেবেছিলেন, সবটা ঠিক ভাবেননি। ক্ষুধার্তদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের সৃষ্টিকর্মে নিজের সময়কে ধরতে পেরেছেন, গভীরে যেতে পেরেছেন। যত প্রচারিত হবে তাঁদের লেখা, ততই ৫০-এর লিরিক উচ্ছ্বাস অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে। দূর দূর মফস্‌সল থেকে বের হতে শুরু হয় কবিতা পত্রিকা, গড়ে ওঠে কবিগোষ্ঠী। এতে আত্মতৃপ্তির কারণ ছিল প্রথমদিকে। এরা তো ৫০-এর কবিদেরই অনুকরণ করবে, স্তুতি গাইবে। অবশেষে তাদের পাঠকে পরিণত হবে। তাদের এই ধারণা একেবারে মার খায়নি, সংখ্যাহীন প্রতিভাহীন তাদের অনুকরণ করে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সবাই নয়। কারুর কারুর মাথা আজ ৫০-এর কবিদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে, টের পাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু

এমন হল কেন? এই শতকে শুরু করা এক বিশাল কবিতা হুল্লোড়, এত ছন্দ, এত চাতুর্য ও মাটি কামড়ে প্রতিষ্ঠা প্রতিযোগিতা, এভাবে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই মরুভূমিতে হারিয়ে গেল কেন? এর একটাই উত্তর : বিনয় মজুমদার ছাড়া আর কেউ, সে সময়ের কোনো কবি জীবনানন্দের ভয়াবহ থাবা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। জীবনানন্দকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছেন, ঠিক। বলেছেন, এলিয়টের চেয়ে বড় কবি কিন্তু পরমুহূর্তে আবেগবশত ভুলে গেছেন তাঁকে। লেখা শুরু করতে গিয়ে তাকাননি নিজের দিকে আর নিজের সময়ের দিকে। ভাবেননি, লেখা শুরু করতে হবে জীবনানন্দের পর থেকে। বুঝতে পারেননি জীবনানন্দ-গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কী করতে হবে। পরবর্তীকালে কেউ কেউ বুঝেছিলেন।

বলা হয়, অ্যালেন গিনস্‌বার্গের কলকাতায় আসা বাংলা কবিতায় নাকি একটা বড় কিছু। মধুসূদন থেকে জীবনানন্দ পশ্চিমে ছুটে গিয়েছেন, শূন্য হাতে ফেরেননি। গিনস্‌বার্গের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ আমেরিকা কি তাহলে যেচে এসেছিল আমাদের দরজায়? আমাদের আর যেতে হল না?—আমার তা মনে হয় না। কিট্‌সের জীবনযাপন খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমাদের মধ্যে, কিন্তু গিনস্‌বার্গের কবিতা বাংলা কবিতাকে কোনোমতেই প্রভাবিত করতে পারে না। সত্যি তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার মতো কিছু ছিল না, তিনি এলিয়ট বা ইয়েট্‌স নন। গিনস্‌বার্গ আমেরিকায় হুইটম্যানের উত্তরসূরি, গোটা আমেরিকা আজ তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করেছে। আমাদের কবিতায় হুইটম্যানেরও কোনো স্থান নেই, গিনস্‌বার্গেরও না। বাংলা কবিতা ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। এলিয়ট ইউরোপের শেষ আধুনিক কবি, এডগার এ্যালান পো দিয়ে, বোদলেয়ার দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, এলিয়টে তার চূড়ান্ত, শেষ। আর জীবনানন্দ দিয়ে আমাদের আধুনিকতার শুরু। ওদের যখন শেষ, আমাদের তখন শুরু। আজ আর ইউরোপে কোনো কবি-ব্যক্তিত্ব নেই। আছে কিছু দলবদ্ধ কাব্য উত্তেজনা। তার সাথে বিপ্লবী রাজনীতির খানিকটা মিশ্রণ রয়েছে হয়তো, নয়তো পুরনো ধর্ম আর আধুনিক রোবট সভ্যতার এক চমকপ্রদ সংমিশ্রণ। সমস্ত সাহিত্য মতবাদ সেখানে শেষ হয়ে গেছে। তারা ছুটে গিয়েছিল সাম্যবাদে—নতুন করে জেগে ওঠার জন্য, তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা এখন ছুটে আসছে প্রাচ্যের দিকে, একটা কিছুতে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার জন্য। তবুও আমাদের পশ্চিমে যেতে হবে, চেতনাহীন চিন্তাহীন ভাষাহীন যন্ত্রসভ্যতার উৎপাদিত কৃত্রিম বীর্যের দাগে ভরা অতি আধুনিক লেখাগুলি অতিক্রম করে, মৃত আত্মাদের কাছে। র‍্যাঁবোর কাছে, ডস্টয়েভস্কির কাছে, কাফ্‌কার কাছে। দেখতে হবে কী আছে আমাদের নেবার।

কিন্তু সমসাময়িকের তীব্র আকর্ষণ অল্প কয়েকজনই অগ্রাহ্য করতে পারে। এখানেও শুরু হয়েছে দলবদ্ধ সাহিত্য উত্তেজনা—চিন্তাশূন্য যা, যা কৃত্রিম। যার আদল ও উৎসভূমি এই সময়ের আমেরিকা, যার ভাষা বাংলা ভাষার মতন মাত্র। বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোর ফরাসি ভাষা, ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও ডিলান টমাসে ইংরেজি ভাষা, এমনকী, সাম্যবাদে ৫০

বছর অতিবাহিত হওয়ার পর রুশ ভাষারও যেন দেওয়ার মতো কিছু নেই। কেউ আর ওইসব দেশের দিকে, ওইসব ভাষা সাহিত্য কবিতার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে না। সবাই তাকিয়ে আছে আমেরিকার দিকে, তার নতুন নতুন উদ্ভাবিত কৃত্রিমতার দিকে, সাম্রাজ্যবাদী বর্বর ও আগ্রাসী আখ্যা দিয়েও, আর সে-কারণেই বুঝি বেশি আকর্ষণ আমেরিকার ছড়িয়ে পড়া ধ্বংস ও দুর্গন্ধের প্রতি। তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চায় গোটা যুব-পৃথিবী। যন্ত্রসভ্যতায় সে সবচেয়ে অগ্রগামী, যুদ্ধ বিভীষিকায় সে ভয়ানক ও ক্রমবর্ধমান, সবচেয়ে বড় কথা, অন্যান্য দেশ ও জাতিসমূহকে নেশাচ্ছন্ন করে রাখবার মতো ক্ষমতা তার আছে। সারা পৃথিবীকে সে টেনে নরকে নামাবেই—এরকম প্রতিজ্ঞা। আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যের উৎস ও প্রেরণা ওই অতি আধুনিক আমেরিকান সাহিত্য। মার্কসবাদকে মান্য করে বা আশ্রয় করে যেসব লেখা লিখতে চেষ্টা করা হয় এ সময়ে, তারও উৎস সেই আমেরিকার বর্তমান বিপ্লবী লেখালেখি। সেখানকার অসারতাকেই এখানে, এই সময়ের আধুনিকতা বলে ভাবা হচ্ছে। অন্তত অনেকের কাছে। এর বিপরীতে রয়েছে 'দেশজ সাহিত্য' 'দেশজ কবিতা'। সে আরও হাস্যকর, পারলে তারা পুরো মঙ্গলকাব্যকে আবার বাংলা ভাষায় ফিরিয়ে আনে, প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিষ্ঠিত এইসব লেখালেখির দিকে তাকালে, মনে হবে জয়দেব থেকে ঈশ্বর গুপ্ত আবার উঠে আসবে। এই দুই ভুল আবেগের মাঝখান দিয়েই সঠিক পথ বাংলা কবিতার মূল স্রোত।

দুই

......এরপর থেকে শুরু হল কাঁচা পথ, বস্তি বাজার গঞ্জের অচেনা অজানা নোংরা ভাঙা কর্দমাক্ত রাস্তা, এই পথে কোনো মাইলস্টোনের প্রয়োজন হয় না। কবিতার এই যাত্রা অন্ধকার যাত্রা, অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, আত্মহনন, উন্মাদনার ও অসুস্থতা এই পথে রয়েছে কিন্তু শেষ নয় এখানেই। এই সবকিছু ছাপিয়ে রয়েছে এক প্রচণ্ড মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা। এই মুক্তি যার যত তীব্র সেই তত সাহস পাবে অন্ধকার অতিক্রম করার। এইসব ছাপিয়ে রয়েছে ভালোবাসা, যাকে সভ্যতা ধ্বংস করে ফেলতে চায়, শুধু কেউ কেউ তাকে সারা শরীরে ও আত্মায় বহন করে নিয়ে চলে। আমরা যা হারিয়ে ফেলেছি, তার জন্য দুঃখ করার, কান্নাকাটি করার সময় সত্যিই নেই। আমাদের মূল্যবোধ, আদর্শ, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রে স্বপ্ন, এই সমস্ত কিছু বিগত। বিগত শতাব্দীর উত্থান ও পতন থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি, অভিজ্ঞতা নিয়েছি কিন্তু সেখানে ফিরে যেতে পারি না। রবীন্দ্রনাথেও আর ফিরতে পারি না, যত কল্যাণকামী হোক না তাঁর চিন্তাধারা। জীবনানন্দ তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক সৃষ্টির জন্য। তিনি পেরেও ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিল ইতিহাস, নিসর্গ ও দর্শন। তাঁর সামনে একটা বড় পৃথিবী খুলে গিয়েছিল। সেই ভাঁড়ার

যেন ফুরোবার নয়, মনে হয়েছিল। সেই ভাঁড়ারও একদিন ফুরিয়ে যাবে স্বাভাবিক নিয়মে। আজ এ সময়ের কবিকে জীবনানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, দূর প্রসারিত তাঁর চেতনা সম্পর্কে সচেতন থেকে, নিজের পথে চলতে হবে।...কবিতা আরও কাছে সরে এসেছে, শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে তার বিষ ও অমৃত। কবি এখন শুধুই আর দ্রষ্টা নয়, শুধু সে বর্ণনা দিয়ে তৃপ্ত নয়। সে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তার রক্তের মধ্যে তার সত্তায় উঠে এসেছে তারই অনুভূত বিষয় ও বস্তু। ভাষাগত পদ্ধতিগত বদল ঘটে গেছে, বাস্তবতার ধারণাও আজ আমাদের ভিন্ন। নন্দনতত্ত্বের কূটাভাস, জীবন যন্ত্রণার কাঁচা ধ্যানধারণা, আত্মবিলাপের আয়োজন এবং জটিলতার আরোপিত দর্শনে আত্মসন্তুষ্টি অপ্রয়োজনীয় আজ। আমরা পেয়েছি এক জটিলতার সারল্য। কবিতা কারুকাজ নয়, কাঠ খোদাই নয়, নয় শুধু আবেগে ভেসে যাওয়া। সে অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে, সে এতদিনের অবহেলিত, অনাদৃত, আপাতদৃষ্টিতে যা কুৎসিত, যা কবির সত্তার সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, লেগে আছে সারা শরীরে, তাকেই তুলে ধরতে চায়, তারই গন্ধ ছড়িয়ে দিতে চায় সারা পৃথিবীময়। বিনয় মজুমদারের মতন নিজেকে পরিত্যক্ত অনাথ শিশু ভাবতে পারে না আর, যাঁর স্থানে-অস্থানে প্রস্রাব ঝরে যায়। পরিত্যক্ত আমরা, এই নির্মম সত্য জেনে যাওয়ার পর আর কোনো দুঃখবোধ নেই। আছে ভেতরের চৈতন্যকে এই অজ্ঞাত জীবনের সামনে নিয়ে আসার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, প্রকৃত সারসের জন্য আর কোনো বেদনাবোধ নেই। সে মরীচিকার পেছনে কবি আর ছোটে না, আমাদের যাত্রাপথে রয়েছে শহরের ঘিঞ্জি বস্তি, নর্দমা, কাঁচা চামড়ার শুকিয়ে ওঠার রোদপোড়া গন্ধ, রয়েছে দরিদ্রমদ, অতীত-ভবিষ্যৎ থেকে ছিটকে পড়া চোখ লাল ও গাল ঝুলে পড়া মাতাল, পা ছড়িয়ে বসা গণিকা, পথে পথে খাবার খোঁজা শিশু, রয়েছে বহুদূর বিস্তৃত ফসলের মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়া গ্রাম, সরে আসা নদী, শুকিয়ে আসা সোঁতা, পথের পাশে লাগানো কৃত্রিম অরণ্য। না, আজকের কবি অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনানন্দ শ্রাবস্তী ও বিদিশার পথে পথে হেঁটেছিলেন। আজকের কবি সেরকমভাবে আর হাঁটতে পারেন না। অতীত তার কাছে শুধুমাত্র অসার ঐতিহ্য নয়। সে আজ তার অন্ধকারে ও আলোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারে মহাভারতের চরিত্র ও মিথগুলোকে, আনতে পারে বুদ্ধের জ্ঞান ও হৃদয়, রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টি ও বোধ। অতীত তার অভিজ্ঞতায়, সৃষ্টিকর্মে এসে জীবন্ত হয়ে উঠবে। মাটির জোনাকি ও মহাশূন্যের নক্ষত্র একই সঙ্গে তার অস্তিত্বে মিলেমিশে যাবে। অবশ্য এসবের বর্ণনা আর কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করে না কবিতার শরীরে। আত্মা শিহরিত হয় না ভয়াবহ দৃশ্যের নির্মম অনুপুঙ্খে ও বর্ণনায়। সব কিছুই আসতে হবে স্রষ্টার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। কবি আশাবাদী না নৈরাশ্যবাদী—এটা বড় প্রশ্ন নয় আর। আশা, নৈরাশ্য, বিদ্রোহ, ছন্দ ও লিরিকধর্মিতা—এইসব কিছুকেই বাংলা কবিতা অতিক্রম করেছে।

৩

যে আগে জেগে ওঠে সে চায় অন্য সবাই জেগে উঠুক। সে তার একা জাগরণ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। কবি চায় তার দেশকে, জাতিকে জাগিয়ে তুলতে কিন্তু অনেক সময়ই তা ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে তার জীবৎকালে। যখন জেগে ওঠে তখন হয়তো কবি মৃত, রয়ে যায় তার লেখাগুলো। এই অবস্থাটাই গাঢ় অন্ধকার, যেটা এখন আরও ভয়াবহ, জীবনানন্দ কেন একা ছিলেন, কেন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন ?—আজ তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও একটা সময়ে ছুটে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে, যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সময়ের জাগরণকে ধরে রাখা, গোটা জাতি যেন আবার ঝিমিয়ে না পড়ে। ঘুমে ঢলে না পড়ে। বিশাল ও ব্যাদিত অন্ধকারের মুখের সামনে সে আয়োজন ও উদ্যোগ যে কত সামান্য সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। শতাব্দী শেষের এই গাঢ় নিদ্রা যে ভয়ংকর, তার কারণ, এই ঘুমও কৃত্রিম। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, হচ্ছে এক একটা জাতিকে। বিজ্ঞান তো আমাদের অনেকদূর নিয়ে এসেছে। তবে ভেঙে পড়ে না এই অন্ধকার পঁথে পায়ে চলা কবি, অন্ধকার তার চোখে সয়ে এসেছে, সে হাঁটতে পারে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে। তীব্র মুক্তি আকাঙ্ক্ষা তাকে চালিত করে।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় আর কোনো কবিতা আন্দোলন, যেমন আমরা দেখেছি সর্বশেষ স্যুরলিয়ালিস্ট আন্দোলন, সে রকম কিছু হবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজনও নেই আর কবিতা বা শিল্পের আন্দোলনের বা ম্যানিফেস্টোর। শুধু প্রয়োজন কিছু কবি-ব্যক্তিত্বের, বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর দিকে দিকে।

১৯৮৯

কবির জীবন, কবিতার শেকড়

......

বিকেল—গোধূলি—অন্ধকারের শুরু। এখানে, গ্রাম গঞ্জের মানুষজন বলে, মুখ আন্ধারি। অর্থাৎ সন্ধ্যার এমন এক আবছায়া অন্ধকার, যাতে মানুষের শরীরটা বোঝা যায়, দেখা যায় কিন্তু মুখটা দেখা যায় না। চেনা যায় না।

শতাব্দী শেষের সেই অন্ধকার এখন। অস্পষ্ট মুখ, লক্ষ্যহীন অভিযাত্রা, নিরর্থক সৃষ্টিপ্রয়াস অথবা প্রচারের আলোয় অন্তত সামান্য সময়ের জন্য আসতে চেয়ে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা। না প্রচারের আলো ঠিক নয়, প্রচারের নারকীয় উল্লাস। কতজন ঝলসে উঠছে এক মুহূর্তের জন্য, আবার ছিট্‌কে পড়ছে অতল খাদে, নামহীনতায়। হারিয়ে যাচ্ছে চিরদিনের জন্য। সবটা মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল নৃত্য, কৃত্রিম, ভণ্ড ও অনুভূতিহীন নৃত্য। সমস্ত নর্তকের লক্ষ্য ওই মঞ্চ। মঞ্চে কেউ পৌঁছতে পারছে, কেউ পারছে না। যে পৌঁছে যায় তার মুখ কিছুক্ষণের জন্য ঝলমল করে ওঠে, যেন সে মৃত্যুর পরও নাচ চালিয়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই সে গড়িয়ে যায় অন্য সব ধেয়ে আসা নর্তকদের পায়ের তলায়। পরিণত হয় মাংসপিণ্ডে।

মোটামুটি চিত্রটা এরকমই। জীবন বোধহীন, চেতনাহীন, সৃষ্টিহীন সময়। প্রেরণা বলতে প্রচার, অর্থ ও পুরস্কার। পেটের দায়ে লেখা। পেটের দায়ে নারীরা যেমন আসে নিষিদ্ধ জগতে, তবু হয়তো তারা সেখানে কেউ কেউ স্বাধীন। এখানে কোনো স্বাধীনতা নেই। চাহিদা ও জোগানের যন্ত্র তুমি, মাঝখানে আছে যন্ত্রচালক ষড়যন্ত্রী, যে তোমাকে ব্যবহার করে মুনাফা লোটে। এটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে করা হয়, করা হচ্ছে।

এতসব সত্ত্বেও সৃষ্টিধারা হয়তো প্রবলভাবে নয়, হয়তো কলরব তুলে নয় কিন্তু বয়ে চলেছে আড়ালে আবডালে। অন্ধকারের নীচে দিয়ে। সৃষ্টিশীলদের এখন খুঁজে নিতে হয়, একটা সময় ছিল একজন পাঠক কত সহজে পেয়ে যেতেন জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, জগদীশ গুপ্ত ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে। আজ পাঠককে আনাচ-কানাচ-এর অন্ধকার থেকে আবিষ্কার করতে হয় সেই লেখক বা কবিকে, যার সৃষ্টিসত্তা আছে, যে জীবন্ত, লজ্জাবশত যে ভণ্ডদের ভিড়ে আসতে চায়নি।

এ তো শুধু নয় শতাব্দী-সন্ধ্যা, এ শতাব্দী-সন্ধিও বটে। এক সন্ধিক্ষণ। এক শতাব্দী গিয়ে আরেক শতাব্দী আসছে। এই বহু প্রসবিনী শতাব্দী একের পর এক প্রতিভাবানদের জন্ম দিয়ে এখন কি ক্লান্ত? নতুন শতাব্দী কিছু দেবে—এই আশা করতে চায় কেউ কেউ। অনেক মানুষ। আমার মনে হয়, দেবে আরও রোবট আরও প্রচারখ্যাত ভণ্ড, আরও

মারণাস্ত্র আর আরও আরও বেশি মানুষের অসহায়ত্ব ও একা হয়ে যাওয়া। তবু দু-একজন, ঝোড়ো পাখির মতো দেখা দেবে হয়তো, কবি ও লেখক। আমরা এটুকু আশা করতে পারি।

সে যাক্‌গে, এই অর্থহীন নারকীয় নাচের বা নৃত্যরত কবন্ধগুলোর মাঝখান দিয়ে আমি ফিরতে পারি আমার কৈশোরে, সেইখানে যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম আমাকে।

বয়সটা এগারো হবে, তার কমও হতে পারে, বন্যার ভয়ংকরতা ও সৌন্দর্যের মাঝখানে বসে লিখে ফেলেছিলাম ছ-লাইনের একটি কবিতা। কবিতার বিষয় ছিল মৃত্যু।

ওহে মৃত্যু, ওহে বন্ধু...

যদ্দূর মনে পড়ছে, এভাবেই শুরু হয়েছিল জীবনের প্রথম পদ্য। অর্থাৎ মৃত্যুকে বন্ধু বলেই সম্বোধন করেছিল গ্রাম্য এক বালক। সদ্য পড়া কোনো কবিতার ছাপ ছিল নিশ্চয়ই। বিশেষ করে মৃত্যুকে বন্ধু ভাবার মানসিকতায়। এটা আমার নয়, অন্যের। কিন্তু কবিতার শেষ ও ছ-নম্বর পংক্তিতে এসে মৃত্যুকে আমি আর বন্ধু ভাবিনি ওই এগারো বছর বয়সেই। তাকে বলেছি 'জন্মান্ধ' আর 'সর্বভুক'। অর্থাৎ এমন একটা ছবি, শব্দ দিয়ে আঁকতে চেয়েছিলাম যে এক বিকটাকার জন্মান্ধ রাক্ষস নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে সবকিছু। যা প্রাণবান, তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা থাবা, প্রথমেই। পরে জড়বস্তুর দিকে। যদিও সেই খাদক রাক্ষসটি অদৃশ্য অথচ প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়াশীল। অতএব সে আমার বন্ধু হয়েও শত্রু বা শত্রু হয়েও...। এতসব চিন্তা-কল্পনার চোটে, আগোছালোভাবে বালক দার্শনিকের দার্শনিকতার ঠেলায় কবিতাটির ছন্দপতনও ঘটেছিল হয়তো। শেষ দু-লাইনে এসে নিজের কানেই কেমন বেসুরো শোনাল, কেমন গদ্য গদ্য হয়ে গেছে। তবু ওই পতিত ছন্দের প্রথম কবিতাটি অনেক দিন আমার প্রিয় ছিল এবং ছিল লজ্জার বিষয়ও।

জলা, জঙ্গল আর আদিবাসী প্রায় মানুষের এক ঘোর গ্রামে আমার জন্ম। শহর থেকে আট মাইল দূরবর্তী গ্রাম, মাঝখানে একটা নদী। সে শহরও আবার একটি মফস্‌সল শহর মাত্র। আধাগ্রাম আধাশহর। পিচ পথ হওয়ায় গাড়ি-গ্রাম থেকে অনেকটা দূরেই ছিল কিন্তু রেললাইন ছিল দু-মাইলের মধ্যে। বাড়ির সামনে বিশাল একটা মাঠ, তার পরেই রেললাইন। সারাদিনে বার ছয়েক যাতায়াত করত ট্রেন, ট্রেনই আমাদের সময় বলে দিত। আশপাশের যারা, তারা বেশির ভাগ ছিল মুসলমান, কিছু স্থানীয় হিন্দু। যাদের বলা হত রাজবংশী। তথাকথিত ভদ্রলোক বলতে পূর্ববঙ্গ-আগত, আমাদের একটি মাত্র পরিবার। আমার শৈশব কৈশোরের সঙ্গী সঙ্গিনীরা সেইসব দরিদ্রঘরের খোলামেলা ছেলেমেয়ে, যাদের মুখে প্রায়শ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ শব্দ, যারা বুঝি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেছে জন্মরহস্য, যাদের বাবা মায়ের কোনো রাখ-ঢাক ছিল না। শিশু বা কিশোর সন্তানদের সামনে যৌন কথায় বা কাজে, রসিকতায় বা আচরণে কোনো সঙ্কোচের বালাই ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, যৌনতা ছিল এদের কাছে আনন্দের বড় এক উৎস। কী কিশোর-কিশোরী, কী যুবক-যুবতী অথবা

বয়স্ক মানুষের কাছে। জীবনযাপনে বাহুল্য ছিল না তেমন, অতি অল্প আয়াসে জমি থেকে ফসল পাওয়া যেত, জলাশয়গুলোতে পর্যাপ্ত মাছ, ঝোপজঙ্গল অরণ্যে প্রচুর বুনো শাক ও সবজি। আর বনবিড়াল, গোসাপ ও খরগোশের মাংস। এদের কাছে যা ছিল স্বাভাবিক, আমার কাছে তা সঙ্কোচের বিষয়। আমার পরিবার তো অন্যরকম। স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কোচ হত প্রথম প্রথম, লজ্জা এবং ভয় হত। কিন্তু সেই আদিম-প্রায় মানব শিশুদের প্রাণ প্রবাহে কোথায় ভেসে গেল আমার লজ্জা-সংকোচ-ভয়। আমি হয়ে গেলাম ওদেরই একজন।

আবার বাড়িতে কিন্তু অন্যরকম। সেখানে ভদ্র-সদ্র, চুপচাপ, মায়ের পিটুনির ভয়ে বই মুখে যেন কত মনোযোগী। আসলে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমার অজান্তেই, আমার জিজ্ঞাসা বড়দের ওই যৌনজীবন নিয়ে। আমার নরম কোমল হাত খুলতে চাইত সমস্ত বন্ধ দরজা। অস্পষ্টভাবে অনুভব করতাম জীবনের বিশালত্ব। আমার জিজ্ঞাসা প্রায় বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছিল : ভাবতাম, গ্রন্থের মধ্যে পেয়ে যাব সব প্রশ্নের উত্তর। আমার অজানা দেশ। অক্ষরজ্ঞানের আগেই যেন আমি পড়তে চাই, এরকম একটা ভয়ংকর অবস্থা। আমার ক্ষুধার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা মায়ের বিয়েতে পাওয়া শরৎ ও বঙ্কিম, ট্রাঙ্ক ভেঙেই পড়ে ফেলি দুর্দম দুঃসাহস নিয়ে। অবশ্য এর জন্য মা-ও দায়ী খানিকটা, সে আমাকে ঘুম পাড়াবার সময় শোনাত রূপকথা। রূপকথা শেষ হয়ে গেলে রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণ ও মহাভারত শেষ হলে বঙ্কিম ও শরৎ বলতে শুরু করেছিল। অবশ্যই জায়গায় জায়গায় বাদ দিয়ে এবং কোথায় বাদ দেওয়া হচ্ছে, সেই বিচ্ছু শিশু বুঝে যেত ঠিক, তার কৌতূহল বেড়ে যেত। একদিকে এই অপার যৌনতা অন্যদিকে আমার চিন্তা, আমার হুমড়ি খেয়ে বইপড়া, রূপকথা, মহাকাব্য, ধ্রুপদি সাহিত্য, আমার শোনা, দেখা, অনুভব করা,—যেন সবটা আমি গ্রাস করে নিতে চাই, বুঝে ফেলতে চাই মুহূর্তে—কিন্তু যার রহস্যের কাছে আমি সত্যি শিশু। এই ভিতরের ও বাইরের বিশৃঙ্খলা আমাকে একা করে তুলল, আমি একা বেরিয়ে পড়তাম গাঁয়ের পথ ধরে, চলে যেতাম দূরে—অনেকটা দূরে, অজ্ঞাত ও অচেনা জায়গায়। আর লিখতাম। অনর্গল ধারায় আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল পদ্য। বাবার নেশা ছিল রাজনীতির, বাড়িতে স্তূপাকার হয়ে ছিল দেয়ালে লাগানোর পোস্টার, সেইসব পোস্টারের উল্টোপিঠে লিখতাম আর বিক্রি করে দিতাম। সের দরে। কাছাকাছির এক মুদি দোকানে। সেদিক দিয়ে ভাবলে আমার কবিতার প্রথম পাঠক সেই বৃদ্ধ দোকানদার, যাকে আমরা 'বুড়াকর্তা' বলে ডাকতাম। সে হঠাৎ একদিন আমার একটি কবিতা হাত নেড়ে, চিৎকার করে পড়ে শোনায় এবং উপদেশ দেয় একটা খাতা বানাতে। সে পরামর্শ দেয়, কিছু কিছু লেখা যেন আমি রেখে দিই। সে আর হয়নি। তবে আমি খাতায় লিখতে শুরু করি আর এমন দোকানদার খুঁজি, যে আমার লেখা সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখাবে না। কেউ আমাকে আমার লেখার কথা বললেই বুক কেঁপে উঠত, লজ্জায় চোখ ফেরাতাম অন্যদিকে। তখনও হাফপ্যান্ট পরা স্কুল বালকমাত্র। যদিও ভিতরে ভিতরে পেকে গেছি অনেকটাই, সে সংবাদ আমার ঘনিষ্ঠতম

সঙ্গীটিও রাখে না।

কবিতার মূল শেকড় রস শুষে নেয় কবির জীবন থেকে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, কবির শৈশব কৈশোরের জীবন থেকে। যদিও একজন স্রষ্টা। সামান্যই এখান থেকে তুলে আনতে পারে। জীবনের যতটুকু তার মুঠোর মধ্যে, স্পর্শের আওতায় ও বোধের এলাকায় থাকে, তার বাইরে থাকে হাজার গুণ বেশি। কবি যতদিক থেকে যতভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, বিশাল অতল অন্ধকার দেশ থেকে যায় ব্যাখ্যার অতীত। শুরু থেকেই আমার উৎসাহ না-জানা সেই দুর্গমের প্রতি, আমার অভিযাত্রা ছিল কুজ্‌ঝটিকাপূর্ণ অন্ধকার অভিমুখী। মূল শেকড় যেমন রস শুষে নেয় গভীর অন্তঃস্থল থেকে, তেমনি শাখা শেকড়গুলো ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্তে। দেশ থেকে দেশান্তরে। ভাষা জানা নেই, মানচিত্রে সেইসব দেশের অবস্থান কোথায় সেও ঠিক জানা নেই তবু কত কম বয়সে বুঝে গেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে বিস্তৃত মরুভূমির উজ্জ্বল বালির উপর অদৃশ্য আগুনে শিখার মতো ভ্রাম্যমাণ আমার পূর্বসূরিরা আপাতদৃষ্টিতে যোগাযোগহীন, তবু বুঝি, দেশ থেকে দেশে, ভাষা থেকে ভাষায় সক্রিয় আমার সহযাত্রীরা।

একটা ব্যাপার এখনও আমার কাছেই রহস্যময় যে, আমার জীবনের শুরু হয়েছিল কবিতা না রাজনীতি দিয়ে? হয়তো দুটোই একসঙ্গে। হয়তো কবিতাই আমাকে নিয়ে গিয়েছে রাজনীতির দিকে। লম্বা পথ অতিক্রম করে এসে আজ বুঝি, একজন কবির রাজনীতির দীক্ষা কবির কাছ থেকেই নেওয়া উচিত। অ-কবির কাছ থেকে নয়। আমার তো মনে হয়, আমার মতন আরও অনেকেই তাই করেছেন। জীবনানন্দে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে আমি প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করলাম। সেই আমাকে আমি এখনও ভাবি, ভাবি কৌতুকের সঙ্গেই, যে পার্টি মিটিং-এ দূর গ্রামাঞ্চলে চলেছে। যার কাঁধের ঝোলায় জীবনানন্দ, বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো, পার্টি ম্যানিফেস্টো নয়।

মূলত কবিতা সতেরো বছরের এক কিশোরকে যে স্বাধীনতার স্বাদ দেয়, যে দরজা খুলে দেয়, তার পূর্ণতা খোঁজে সে রাজনীতিতে। বোঝে সে, কবিতা দিয়ে আবহমানের এই পায়রার খোপগুলোকে ভেঙে ফেলা যাবে না। তার জন্য অন্য একটা অস্ত্র চাই, সেই অস্ত্র রাজনীতি। অবশ্য এই বোঝার মধ্যেও ভুল থেকে যায়। ভুলটা বুঝতে পেরেও কতজন গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার পথ পায় না। বেরুবার ইচ্ছেও হয়তো হয় না আর তাদের।

গোলকধাঁধায় কারা আরামেই আছে।

আমি নিষ্ক্রমণের পথ পেয়ে যাই সেই মুহূর্তেই। কিন্তু ফিরে আসা যায় না আর আসিও না। আমি অতিক্রম করি এবং বুঝি শব্দ, সংখ্যা ও সুর আমার সম্পদ, দলবদ্ধ উত্তেজনা বেশি দূর এগিয়ে দেবে না আমাকে। একে কবির নিয়তি না বলে কবির পথই বলব, শুরু থেকে যে সে-পথে হাঁটছে, সে সৌভাগ্যবান।

তবু যা যন্ত্রণাদায়ক, তা হল :

পায়রার খোপ থেকে ঝরে পড়ে সুপ্রাচীন সু—
আমার মাথার উপর আমারই হাজার হাজার স্বপ্ন কল্পনা
ঝরে পড়ে, লেপ্টে যায়, দুর্গন্ধে জাগিয়ে তোলে স্বর্গীয় বাজনা
অর্কেস্ট্রা শুরু হল, বেশ্যারা ফেলে শুধু থু

একটা শিশুর কাছে প্রথম প্রতিবন্ধক তার পরিবার। পরিবার তার স্বাধীনতার পথে বাধা, পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সামনে নিশ্ছিদ্র দেয়াল। যে শিশুর মধ্যে এককণা চেতনা ঢুকে গেছে, যে শিশুর মাথায় কবিতার বীজ অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার অপেক্ষায়; পরিবার তাকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পরিবার থেকে আক্ষরিক অর্থে পলায়নেও সমস্যার সমাধান হয় না। যখন সে পলাতক জীবনযাপন করে, সেই অনিশ্চিতি ও মৃত্যু-তাড়নার মধ্যে আর যাই হোক কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়। পলায়ন নয়, পরিবারের মধ্যে থেকেও পরিবারকে অতিক্রম করে যেতে হবে, আমাকে বুঝতে হয় কৈশোরেই। পায়রার খোপগুলোকে, বদ্ধ সমাজকে অস্বীকার করি নিঃশব্দে। কিন্তু তা চাপা থাকে না। আমার আচারে আচরণে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, না-বাচক ভঙ্গিতে এবং স্বাধীনতা স্পৃহায় ওরা ঠিক বুঝে যায়। পরিবার আর সমাজের সদস্যরা আমাকে শুধু সন্দেহের চোখে দ্যাখে না, আক্রমণও করতে শুরু করে। যে-কোনো মূল্যেই তারা চায়, আমি যেন তাদের মতো হই, আমাকে যূথবদ্ধতায় লীন করে নিতে উঠে পড়ে লাগে ওরা। আমাকে গর্জন করে উঠতে হয় স্বাভাবিকভাবেই, তর্ক করতে হয়, সংঘাতের পথ আমি এড়াতে পারি না। একেবারে হেরেও যাই না আমি, আমার কিছু সমর্থক ও উৎসাহী বন্ধু জুটে যায়, যারা আমার চিন্তা করতে পারার, নতুন ও বিদ্রোহী কথা বলতে পারার সাহস দেখে মুগ্ধ। অবশেষে, ওরা আমার আশা ছেড়ে দেয়, আমাকে অসামাজিক বলে ঘোষণা করেও কোনো রহস্যময় কারণে আমার প্রতি একটা অনুকম্পা বা আকর্ষণও বোধ করে। ওদের অজানা নিশ্চেতনার একটা অংশ বুঝি আমাকে ভালোও বাসে, কিছু চায় আমার কাছ থেকে। ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে দাঁড়াতে চায় যদিও উপরে উপরে ঘৃণার ভাবই পোষণ করে আমার প্রতি। সেই সভ্যতার শুরু থেকে কবির সঙ্গে যূথবদ্ধতার বা তথাকথিত সমাজের এরকম স্ববিরোধী সম্পর্কই বুঝি চলে আসছে। যারা তাকে জন্ম দেয় তারা তাকে হত্যাও করতে চায় আবার রাখতেও চায় বাঁচিয়ে।

সে যা হোক, আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম ওইসব হজ্‌পজ্‌ থেকে। চোখ তুলে তাকিয়ে আমার যা দেখার, তা হল গোটা মানুষ ও গোটা মানুষী আর তাদের জীবন। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। নারী ও পুরুষের সহবাস, শিশুর জন্ম, মৃত্যু। এবং প্রকৃতি। মানুষকে এনে একেবারে প্রকৃতির মধ্যে বসিয়ে দিতে পারলাম আমি। আর শব্দের প্রবল স্রোত আমাকে নিয়ে চলল দূর উজানে।

এতসব সত্ত্বেও আমার মধ্যে মৃত ধারণাগুলোর চলাফেরা টের পাই, মুক্তি বাইরের দিকে যতটা ভেতরের দিকে ততটা হয়নি। যতই বলি না কেন, 'আমার মাথার উপর আমারই হাজার হাজার স্বপ্ন কল্পনা/ঝরে পড়ে, লেপ্টে যায়, দুর্গন্ধ জাগিয়ে তোলে স্বর্গীয় রীমা-কেবাজনা'। যে স্বপ্ন ও কল্পনাগুলোকে আমার নিজের বলে ভেবে আসছিলাম, তার বেশির ভাগই ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। মৃত, গলিত ও দুর্গন্ধময়। আমি আমার শ্রেণীর উপর, নিচু, মধ্য ও উঁচু, সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। অবশেষে বর্জনই করি। বহু ব্যবহৃত পুরনো ধারণার সঙ্গে একটু-আধটু নতুনত্ব মিশিয়ে তথাকথিত স্বর্গীয় বাজনার সৃষ্টি করা যায় বটে। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও প্রচলিত সাহিত্য ধারাও তাই চায়। কিন্তু কোনো স্রষ্টা এভাবে নিজের কবর খুঁড়তে পারে না। আমি ভিতরের ও বাইরের দু-দিক থেকেই আমার শ্রেণীকে বর্জন করি। সেই কোন্ কৈশোরেই জড়িয়ে পড়ি গণিকা জগতের সঙ্গে। এটা যে আমি খুব একটা ভেবে করেছিলাম, তা নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবনার সময়ও সে বয়সে সম্ভব নয়, ছিল না। একটা শক্তি আমার অভ্যন্তর থেকে চাপ দিচ্ছিল, ফেটে পড়তে চাইছিল, তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল আমাকে। সৃষ্টির পক্ষে যে জায়গাগুলো উপযোগী সেদিকেই প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হচ্ছিলাম আমি।

অবশ্য গণিকা, মাতাল ও অপরাধীদের মধ্যে এসেও শুনি সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শঠিথ ঐকতান সুর। তবে তাদের প্রতিক্রিয়ায় প্রথাবদ্ধ মানুষীয়ানা থেকে তাদের বেরিয়ে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর উজ্জ্বল বিকার আমাকে মুগ্ধ করে। এখানেও 'অর্কেস্ট্রা শুরু হয়' কিন্তু 'বেশ্যারা ফেলে শুধু থু।'

আমার জীবনের রসায়নে, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণকারী গ্রাম্য বালক, হাতছানি দিয়ে ডেকে নেওয়া সদ্য যৌনরহস্য ভেদ করা রহস্যময় কিশোরী, বিদ্রোহী চাষি বউ, অত্যাচারী ধর্ষক, শরৎ-বঙ্কিমের উপন্যাস খুঁজে হয়রান সদ্য বিধবা থেকে শহরপ্রান্তের গণিকারা মিশে যায়। আর আমার পড়া গ্রন্থগুলোতে দেখি, জীবনের ওই মূল স্রোতকে বেশ ভালোভাবেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে প্রশ্নটা আমাকে আলোড়িত করে চোদ্দ বছর বয়সেই, সে হল, যা মিথ্যা তাই কি শিল্প? শিল্পকে কি কৃত্রিম হতেই হবে ? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে, জীবনের মধ্য দিয়ে, লেখালেখির মধ্য দিয়ে, চিন্তা চেতনা অভিজ্ঞতা আর বিরলতম গভীর গ্রন্থের মধ্যে থেকেই জানতে হয়। আমার বোধের কাছে স্পষ্ট হয় শিল্প মিথ্যা বা কৃত্রিম কোনোটাই নয়। জীবনের সত্যের সঙ্গে শিল্পের সত্যের এমন একটা সম্পর্ক রয়েছে, যার একটাকে বাদ দিলে অন্যটি পঙ্গু। শিল্প পূর্ণসৃষ্টি, পুনর্নির্মাণ নয়।

সে যাকগে, আমাকে আমার ভিশান, আমার গতিমুখের লক্ষ্য, আমার ভিতরের সঞ্চিত উপাদানগুলোকে বুঝে নিতে হবে, বুঝে নিয়ে শুরু হবে আমার যাত্রা। শুরু থেকে শেষের দিকে যাওয়া। আমার এই লেখালেখিকে যদি সমাজ স্বীকার না করে, পৃথিবী মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবুও পরোয়া নেই। বয়ঃসন্ধির দ্রোহ অনেকের ক্ষেত্রেই যৌবনে এসে ভেঙে পড়ে। কেউ কেউ আমৃত্যু দ্রোহী, শৌখিন নয়, শুধু নৈতিবাদী নয়, কোনো কৃত্রিম আদর্শ বহনকারী

নয়, কোনো উত্তেজনাকর দূর-আশার টনিকও তাকে নিতে হয় না, সে পৃথিবীব্যাপী সভ্যতা জুড়ে রাশি রাশি সুউচ্চ বীভৎস দুর্গ-প্রাকারের বাইরে বিস্তীর্ণ মহাদেশ আবিষ্কার করে, পেয়ে যায়। দুর্গাধিপতির কাছে আত্মসমর্পণ না করলেও তার চলে।

এবং একজন লেখক বা কবি তার সম-সাময়িক সাহিত্যিক ও চৈন্তিক আন্দোলনগুলোর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়। সে আন্দোলন কখনও হয় স্ব-ভাষায়, কখনও বা দূর দেশের অন্য ভাষায়। কবির কাছে মুহূর্তে খুলে যায় সেই দূরত্ব। জীবনানন্দের সময়ে জীবন্ত ছিল স্যুররিয়ালিজম আন্দোলন। গোটা ইউরোপ মহাদেশ জুড়েই শুধু নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছিল দূর এশিয়ার ভাষা-সাহিত্যেও। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে তখন শুরু হয়ে গেছে কল্লোল যুগের বাস্তববাদী আলোড়ন বা আন্দোলন। সে আন্দোলন ছিল চিন্তার দিক থেকে সংকীর্ণ, চরিত্রের দিক থেকে অনেকটাই গ্রাম্য। তবু তার মূল্য ছিল। জীবনানন্দের নিজ ভাষার সাহিত্য-আন্দোলনের চেহারা চরিত্র বুঝে নিতে বেশি সময় লাগেনি। বলা যায়, তিনি কল্লোল যুগের উচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলেন আরও বড় জায়গায়, বিশ্ব সাহিত্যের দরজায়। স্যুররিয়ালিজম্ ছিল যুক্তি থেকে মুক্তি, চেতন থেকে অবচেতনের দিকে যাত্রার এক দিকনির্দেশ, বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের সংমিশ্রণ। এ কথা তো বহু আলোচনায় বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে, পর পর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ছিন্নভিন্ন ইউরোপ তার মূল্যবোধ তুল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিল, বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে জন্ম নিল প্রথমে ডাডাবাদ, পরে অধিবাস্তববাদ। সে সবের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আমি আর যাচ্ছি না। দেশে ও বিদেশে সৃষ্টিশীল কবি ও শিল্পীরা তখন নতুন জীবন ও শিল্প সত্য খুঁজে নিতে চাইছে। আধুনিক লেখালেখির দ্বিতীয় পর্ব এখান থেকেই শুরু, প্রথম পর্বের নায়ক অবশ্যই ডস্টয়েভস্কি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো.... এঁরাই। জীবনানন্দ তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তাঁর ইতিহাস চেতনা প্রবাহকে। .....শতাব্দীর বড় ও বিস্ফোরক অধিবাস্তববাদী আন্দোলনও স্বাভাবিকভাবেই একটা জায়গায় সে থেমে যায়, যেখান থেকে বা তার গর্ভ থেকেই জন্ম নেয় নতুন আন্দোলন।

১৯৫০-এর পর পর, আমি যখন সদ্য যুবা তখনই কলকাতায় একজন মাত্র কবিকে তরুণ কবিরা বিপুলভাবে অবিষ্কার করলেন, তাঁকেই পূর্বসূরি হিসেবে স্বীকার করলেন। তিনি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দকে টি. এস. এলিয়টের চেয়ে বড় কবি বলে ঘোষণা করলেন পঞ্চাশের তরুণ এক কবি। এই ঘোষণার মধ্যে অতিশয়োক্তি ছিল না বরং ছিল আন্তরিকতা। ইউরোপ বা আমেরিকায় শুরু হয়ে গেছে বিট বা বোহেমিয়ান আন্দোলন। শুরু হয়েছে পূর্ববর্তীদের, অনেক জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকের নির্মম সমালোচনা, নতুন করে আবিষ্কৃত হচ্ছেন আপেলিনেয়র, আঁর্তো, লুই ফার্দিনান্দ সিলিনের মতো দলছুটরা।

সেই ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলা ভাষাতেও, আমরা দেখলাম জীবনানন্দ পরবর্তী আধুনিক লেখালেখি, কবিতা ও গদ্যের জন্ম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও। এই মৃত্যুর অনেক কারণের মধ্যে বড় একটা আন্দোলনের শেকড় কোনো কবি-ব্যক্তিত্বের জীবনে

ছিল না। উচ্ছ্বাস ছিল, আবেগ ছিল, ছিল শৌখিনতা কিন্তু জীবনপণ করে যে লেখা, যে লেখা সময়ের বুকে ছাপ রেখে যাবে, চিহ্ন রেখে যাবে, প্রচারের আড়ালে থেকেও সেই সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করার ক্ষমতা প্রায় কারুরই ছিল না। দু-একজন যাঁদের ছিল, তাঁরা ছিট্‌কে পড়লেন বাইরে, মঞ্চ থেকে দূরে, মঞ্চ আবার অধিকার করে নিল প্রথাগত প্রতিষ্ঠানভুক্ত গ্রাম্যতা।

....এইসব আলোড়ন আন্দোলন থিতিয়ে এল, দল ভাঙল, সাহিত্য বা কবিতার ম্যানিফেস্টো লেখার প্রয়োজন হল না আর। কিন্তু জীবনানন্দ পরবর্তী সময়ের মূল লেখালেখি থেমে থাকেনি তাই বলে। বরং প্রচারের বাইরে, শুরু হল নতুন করে আবার। ....এটা ঠিক যে, একজন কবি এত কিছু দেখে শুনে তার লেখালেখি শুরু করে না। শুরুটা করে তার সহজাত আবেগ থেকে। শুরু করেই প্রতি পদে বাধা, এই বাধা শুধু ভাষার দিক থেকে, শুধু প্রকরণ বা রচনাশৈলীর দিক থেকে নয়। সে টের পায়, ভয়ংকরভাবে উপলব্ধি করে, যে মাটি থেকে তার মূল রস শুষে নিতে চায়, সেই মাটিই অনুর্বর, রসহীন ও দূষিত। পাতাল অব্দি শেকড় চালিয়েও সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না। তাকে বর্জন করতে হয় সেই ঊষর দিগন্ত। বেরিয়ে পড়তে হয় নতুন মাটির খোঁজে। নতুন ভূমিতে সে নিজেকে স্থাপন করতে চায়।

আমি আমার সামান্য লেখালেখি শুরু করে যথারীতি তীব্র সংকট অনুভব করেছি এবং বেরিয়ে পড়েছি। সেই দূর কৈশোর থেকে আমার যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথাগত যা কিছু তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে আমারও সেই সাফল্য আসত যা গৃহপালিত বিড়ালের 'মাছের কাঁটা'র সফলতা সদৃশ। একে ঘৃণা হয়েছে আমার, ওই সাফল্যের চেয়ে নতুন ভূমিতে নতুন সময়ে চূড়ান্ত অসাফল্যকে শ্রেয় বোধ হয়েছে।

সৌন্দর্য সম্পর্কে সাবেকি ধারণা, নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আবহমানের ভ্রান্তি, শিল্প সম্পর্কে সমস্ত পুরনো ফতোয়া......সবকিছুই ঝরে যায় আমার মধ্যে থেকে। বুঝি, এর পরিণাম আমাকে ভোগ করতে হবে। বুঝি, আমার ভাষা আমার ভিশানকে প্রাণপণ অস্বীকার করতে চাইবে, নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইবে পরিত্যক্ত ভূমির প্রথাবাহী লেখক, আলোচক, সংস্কৃতিবেত্তা এবং তাদের উপভোক্তারা। তারা, যারা শুধু রকমফের চায়, পুরনো আদল অটুট রেখে একটু বৈচিত্র্য চায় মাত্র—সময়ের চাহিদা মতন। তারা আমূল পরিবর্তন চায় না, চায় না অনিশ্চিত কোনো পথ। আমি সেখানে অনিশ্চয়তায়, অন্ধকারে বিপথিক।

অভিযোগ ওঠে, তুমি বড় বেশি চিৎকার করো, তোমার লেখা চিৎকৃত, অশ্লীল ও কাঁচা, তার পাশাপাশি এই অভিযোগও বিদ্রূপের ভাষায় জানানো হয়, বড় আত্মমগ্ন তুমি আর আত্মকেন্দ্রিক। এই জন্য সাহিত্যের মূল স্রোতে আসতে পারলে না। পেলে না প্রভূত অর্থ, খ্যাতি ও পুরস্কার। আমরা তোমাকে কোনো মূল্য দিইনি, দেব না আর, ভবিষ্যতেও কেউ দেবে বলে মনে হয় না...এবং তখনও আমার নিজের সম্পর্কেই মনোযোগী হওয়া উচিত যখন এইসব অভিযোগ উপহাস ভেসে আসে। তেমনি আমার চারপাশে যে

বিশৃঙ্খলা, যে হট্টগোল ও আন্তরিক সৃষ্টিপ্রয়াস, তার প্রতিও স্বাভাবিকভাবেই উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না। আজ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেশ কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, বাংলা কবিতায় দীর্ঘ একটা প্রচেষ্টা দেখা গেল, জীবনানন্দকে এড়িয়ে গিয়ে আবার রবীন্দ্রচেতনাকে উজ্জ্বল করে তোলার—এখনও যার জের চলছে। কিন্তু সে প্রয়াস প্রথম একটু নতুন রকম মনে হলেও আজ সে চেষ্টা মাঠে মারা যাচ্ছে, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে, সেটা সেই পথের যাত্রীরাও বুঝে যাচ্ছেন। আজ এই সময়, জীবনানন্দ পরবর্তী সময়। তাঁকে স্বীকার করেও অনেকটাই দূরে চলে এসেছি আমরা। জীবনানন্দ মরুভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর আচ্ছন্ন কথামালা, আমরা মরুভূমির অভ্যন্তরে এখন। জীবনানন্দের সময়ে যারা অন্ধ তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আজ তারা অন্ধ বা চক্ষুষ্মানই নয়, তাদের অদৃশ্য নির্দেশে দৃষ্টিবানদের দ্রষ্টব্য বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয়, পথ চলতে হয়। জীবনানন্দের সময়ে এই গ্রহের ছিল গভীর গভীরতর অসুখ। আজ সে বিকারগ্রস্ত ও প্রলাপে পরিপূর্ণ। ...এই যখন পরিপ্রেক্ষিত, এই যখন আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তবতা তখন বিশুদ্ধ শিল্প বা কবিতা অথবা সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের ভাবাদর্শে সৃষ্ট কবিতাও অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য শিল্প, সৌন্দর্য ও বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে তবে তা পূর্বনির্ধারিত প্রথাগত পথে নয়, ওই বিষয়গুলো আজ ভিন্নমাত্রা পেয়ে গেছে। শিল্প আজ জীবনসত্যের সঙ্গে যুক্ত। কুৎসিত বলে যেসব বিষয়কে এই সেদিনও অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে, আজকের কবি তার মধ্যেই সৌন্দর্যের বিকশিত হয়ে ওঠাকে দেখতে পান। বিদ্রোহ আজ ব্যক্তি মানুষের আত্মউন্মোচন ঘটানোর সাথে সাথে, বাদ-প্রতিবাদে ভরা পরিকাঠামোকেই অস্বীকার করতে চায়।

কবিতা বড় বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে?—অভিযোগ মিথ্যে নয়। যে বিষয় একান্তভাবে জীবনঘনিষ্ঠ নয়, তাকে কবিতায় আনতে চান না আজকের কবি। যদি বা আনাও যায়, দেখা যায় গোটা সৃষ্টিটাই কেমন প্রাণহীন ও নীরক্ত হয়ে উঠেছে। কবির পক্ষে, আজ আর বাইরে থেকে, বিবরণ দিয়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়। তাকে শুরু করতে হয় ভিতরের থেকে, নিজের মধ্যে থেকে শুরু করে তাকে যেতে হয় বাইরের দিকে। সে জন্যে আজ তার কাছে ইতিহাসচেতনা তাৎপর্যহীন, তার সময়চেতনা আছে। সে সময় যেমন তার অন্তর্গত আপন জীবনসময়, তেমনি সে সময় বৈশ্বিক ও মহাজাগতিকও নিশ্চয়ই। আজ যা আছে তা হল, ইতিহাসহীনতার ইতিহাস। আদর্শহীনতার আদর্শ। চিন্তাহীনতার চিন্তা। এই অবস্থা থেকে এ সময়ের কবিকে আপন অনুভূতি, উপলব্ধি ও দর্শনবোধের উপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু করে, তাকে দূরে, আরও দূরে, একটা বড় জায়গায় যেতে হবে। যেতে হবে আত্মমগ্নতাকে বিশ্বমগ্নতায় রূপান্তরিত করে। আর তার পথ তাকেই নতুনভাবে সৃষ্ট করতে হবে। কারণ প্রথাগত সমস্ত পথ আজ তার কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে।

১৯৯৯

শার্ল বোদলেয়ার : জীবন ও জীবনের পথ

......

দুজন বন্ধুর কথা ভাবা যাক—দুজন কবি বন্ধু। একজন চলে গেল প্রতিষ্ঠা, পুরস্কার ও প্রচারের দিকে। অন্যজন পা বাড়াল নগরপ্রান্তের অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন নিচু শহরের দিকে। না, কোনো অভিমানে নয়, দুঃখে বা নেশায় পড়ে নয়। এমনকী জীবনকে দেখতে যাওয়া বা মাতাল লম্পট খুনি ও গণিকা জীবনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেওয়ার মতো কোনো শৌখিন ধারণা থেকেও নয়। যে যায়—তাকে যেতে হয় বলে। ইংরেজিতে কি একে enlightenment বলব! হ্যাঁ, enlightenments জীবনের একটা মুহূর্তে জ্বলে ওঠা—বাইরের সামান্য ইন্ধনের অনুপ্রেরণায় জ্বলে ওঠা, সেই মুহূর্ত আলোয় সে দেখতে পায় তার জীবন সত্যকে—জীবন পথকে, সে সেদিকে পা বাড়ায়। প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান বন্ধুটির আলোকপ্রাপ্তি ঘটেনি, জ্বলে ওঠেনি সে। তার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ বা উজ্জ্বল নিরানন্দ যাই থাক—তিনিই আমাদের আলোচ্য। তিনিই আজ প্রাসঙ্গিক, অন্যজন নয়।

আলোকপ্রাপ্তি বা জ্বলে ওঠার ব্যাপারে আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনায় যেতে হয়তো পাঠকের ভালো লাগবে। সিদ্ধার্থের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসকে প্রত্যক্ষ করার সেই গল্প তো অনেকেরই জানা। যে অভিজ্ঞতা তার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়। অভিজ্ঞতা বলব না, বলব আঘাত—যে আঘাতে সে জেগে ওঠে। জীবন, সত্য ও দ্রষ্টার মাঝখানে যে কুয়াশা অনড় হয়ে থাকে। এক মুহূর্তে তা সরে যায়। সে তার প্রকৃত পথ খুঁজে পায়। অথবা বালক গদাধরের সেই প্রথম বিশ্বরূপ দর্শন। মাঠে গরু চরাতে গেছে সে, বৈশাখের সেই অপরাহ্নে পশ্চিম আকাশ জুড়ে মেঘ নীল হয়ে উঠেছে। ঝড় শুরু হবে, শুরু হবে কালবৈশাখি। মেঘের সৌন্দর্য কিন্তু বালককে ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। খেতের আলে বসে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে, বাড়ি থেকে আনা বাসি ভাত কচ্‌লে মেখে নিয়েছে মাত্র, শুধু গ্রাস মুখে তোলার অপেক্ষা। কিন্তু ভুলে গেছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, চোখ দিগন্তপ্রান্তে, ঊর্ধ্বে আকাশে। হঠাৎ স্তব্ধ, গাঢ় ও নীল মেঘের বুকে এক সারি সাদা বক। মেঘমালার বুকে চলন্ত বকের সারি। আর সহ্য করতে পারেননি গদা, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। 'আলোকপ্রাপ্তি' ঘটল, গদাধরের রামকৃষ্ণে রূপান্তরিত হওয়ার সেই প্রথম ধাপ। সাধারণে ভাবল, নির্ঘাত মৃগী।

বাংলা কবিতার মনোযোগী পাঠকের 'আলোকপ্রাপ্তি' ঘটেছিল জীবনানন্দে এসে। আমরা এমন কিছু চাইছিলাম যা আমাদের আধুনিক পৃথিবী মানুষ ও জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। এক মুহূর্তে যুক্ত করে দেয়। শব্দের ঝংকার, ছন্দের বৈচিত্র্য বা গতানুগতিক দার্শনিকতা

ছাপিয়ে অন্যকিছু। রবীন্দ্রনাথ যদিও তিনি বিশ্বমানের তবু তাঁর ভাষা ও বিষয় আমাদের ক্লান্ত করে তুলেছিল। আমাদের পেরোতে হয়েছে রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের গ্রাম্যতা। জীবনানন্দ আমাদের ভেতর থেকে রবীন্দ্রনাথকে অপসারিত করলেন—যেন একটা মৃদু টোকায়। কোনো শব্দ-বিস্ফার ঘটিয়ে নয়। আমাদের মধ্য থেকে ঝরে পড়ল হাজারো গ্রাম্যতা। আমরা হয়ে উঠলাম আন্তর্জাতিক, কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস—একই নিশীথ সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাংলা কবিতা পাঠকের তখন বয়ঃসন্ধিকাল। এরও পরে, যখন আমাদের হাতে এল টীকা ও ভাষ্য-সহ শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, তখন আমরা সদ্যযুবক।

গ্রামের পোস্টাপিস থেকে ভি পি ছাড়িয়ে প্রথম ছবি দেখি জান দ্যুভাল-এর, পরে বোদলেয়ার-এর। বোদলেয়ারের চোখের দিকে, মুখের দিকে তাকাতে ভয় হয়। তীব্র দৃষ্টি, দৃঢ়ভাবে চেপে রাখা ঠোঁট, চুল ঝরে যাওয়া মাথার খুলি, ভাঙা গাল আর কুঞ্চনহীন শূন্য বিস্তৃত ললাট। এ যদি বিষাদ হয় তবে তা জ্বলন্ত বিষাদ। ধীরভাবে পাতা ওল্টাই। বোদলেয়ারের আত্ম-প্রতিকৃতি, বোদলেয়ারের আঁকা তাঁর সেই একসময়ের প্রেমিকা। হ্যাঁ, আবার সেই জান দ্যুভাল। যাকে আমাদের কাছে বেশি পরিচিত মনে হয়, কবির চেয়েও। যেন গত সন্ধ্যায় মফস্সলের এই গঞ্জের পথে শেষ হেঁটে যেতে দেখেছি। কঙ্কালসার কিন্তু উদ্ধত ভঙ্গিটি ঠিকই আছে যা আমাদের তাকে চিনিয়ে দেয়। জান দ্যুভালরা এভাবেই ঘুরে বেড়ায় প্যারিস থেকে দূর দরিদ্র প্রাচ্যের এক আর্তগ্রাম অবধি, যেমন প্রবাহিত হয় তাঁর কবিতা, তাঁর চেতনা। শান্তভাবে পাতা ওল্টাই, হাটখোলা থেকে কিছুটা দূরে, ছোটখাটো একটা রেলব্রিজের একটা উঁচু থামের মাথার উপর উঠে বসেছি। থামের মাথাটা মসৃণ, দুজন বসার মতো, নীচে গভীর খাদ আর নিরিবিলি। এদিকে কেউ আসবে না। আর এই ছোট লাইনে দিনে একবারই মাত্র ট্রেন যায় ও আসে।...নিঃশব্দে আমি মুখোমুখি হই, প্রথম ভূমিকা কবিতার, অচেনা মানুষের—

> বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :
> তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীকে?
> পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—কিছুই নেই আমার।

গ্রন্থ থেকে চোখ সরিয়ে নীচের দিকে—দূরের দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি। নিঃশব্দে বয়ে চলেছে নিঃসাড় নদী, বহুদূর বিস্তৃত বালির চড়া, মাঠ, ছোট ছোট বাড়িঘর ও গাছপালা, আকাশ নেমে পড়েছে উপুড় হয়ে। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগের আলো এসে পড়ে প্রাচীন এই ব্রিজের উপর। জল ঘোলাটে ও রঙিন দেখায়। নীচের গৃহস্থালি ও মানুষজন এক মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে ওঠে। তার পরেই ছায়া নেমে আসে, আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকে প্রকৃতি আর তার সন্তানেরা। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। নদী শুধু তার সাদা বুকটি নগ্ন করে রাখে আমার চোখের নীচে।

বাবা, মা, ভাই বোন—শুধু বোদলেয়ারের কেন, কোনো কবিরই থাকে না, ছিল না কোনো দিন। থাকে না কবিতামগ্ন কোনো পাঠকেরও! এই যে অপস্রিয়মাণ মানুষ যাদের নাম দেওয়া হয়েছে জনসাধারণ, তাদের থাকে কি? আহ্, এই অনুভূতি তো আমার। যদি এ অনুভবকে, উপলব্ধি বা নির্মম সত্যকে অন্য কোনো ভাবেও প্রকাশ করতে পারতাম! মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ এই, তা পড়ার পর পাঠকের মনে হবে, এ তো আমারই কথা, আমিও তো এরকম ভেবেছি, শুধু শব্দে রূপ দিতে বা রূপান্তরিত করিনি আলস্যে বা ভয়ে। আমারও মনে হয়েছিল। আর যে অস্পষ্ট কুয়াশা হাল্‌কাভবে ছড়ানো ছিল মানব সম্পর্কের সততার উপর, তা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। আমি একজন পূর্বসূরি সঙ্গী পেলাম, পেলাম একজন সাহসী আত্মীয়কে। প্রকৃত স্রষ্টাকে। আমার দ্বিধা শেষ, সংকোচের অবসান, ভয় নেই কাউকে,—আমার সামনে উন্মুক্ত পথ।

বোদলেয়ারকে বুদ্ধদেব বসুর মধ্য দিয়ে পড়ার পর আমি যখন তাঁর লেখা ইংরেজি অনুবাদে পড়ি তখনও আমার মনে হয়নি বুদ্ধদেব বোদলেয়ারকে অনেকখানি বিকৃত বা ভুলভাবে অনুবাদ করেছেন। এ আমার সৌভাগ্যই বলা যায়। বুদ্ধদেবকে কল্লোল যুগের লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যদিও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সে প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন কিছু সাহসী পদ। সবচেয়ে বড় যেটা, সেটা হল পশ্চিমের নতুন, আধুনিক সাহিত্যকে তিনি নিয়ে এসেছেন বাংলা ভাষায়—বাংলা ভাষার একটা সংকটের সময়। বাংলা সাহিত্য যখন ছুটে যাচ্ছিল ঘোরতর এক গ্রাম্যতার দিকে। একদিকে শহুরে গ্রাম্যতা, আরেক দিকে অজ পাড়াগাঁর গ্রাম্য অনাসৃষ্টি—বাংলা সাহিত্যকে আপদমস্তক মুড়ে নিতে চাইছিল। অবশ্য জীবনানন্দ তখন সৃষ্টিশীল, লিখছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, কিন্তু নিঃসঙ্গ ভাবে, অপরিচয়ের দ্বিধা নিয়ে পায়ে পায়ে প্রবেশ করছেন বাংলা লেখালেখির জগতে। যদি বোদলেয়ার অনূদিত না হতেন এবং রিল্‌কে আর তাঁর পরামর্শে ও প্ররোচনায় যদি র‍্যাঁবোকে আমরা বাংলা ভাষায় না পেতাম তাহলে হয়তো দীর্ঘদিন জীবনানন্দ দাশের নাম লেখা হত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পাশে। আজ কোনো কবি যশঃপ্রার্থী গ্রাম্যযুবকও এক নিঃশ্বাসে এই নাম দুটি উচ্চারণ করবে না। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আঘাতের প্রয়োজন ছিল। সে আঘাত মূলত দিয়েছেন এই দুইজন। জীবনানন্দ তাঁর সৃষ্টি দিয়ে, বুদ্ধদেব তাঁর উদাম্ উদ্যোগ ও নিষ্ঠা দিয়ে।

সে সময় আমার প্রথম যৌবনের অপরিণত আবেগ নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলাম বোদলেয়ারকে—সেই গঞ্জের অন্ধকারে। বোদলেয়ার এসেছেন বহুদূর এক ভারতীয় অনুজ ও শিষ্যের সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষে এক দুঃস্থ ও নগণ্য গ্রামে। অনেক দেরিতেই এসেছেন। রেনেসাঁসের ধারা রবীন্দ্রনাথে এসে শেষ হয়ে গেছে। কিছু সময়ের জন্য এই ভাষার সৃষ্টি জগৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চিন্তা ও চেতনা হঠাৎ বিশ্বচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ খানিকটা দিশেহারা, প্রচণ্ড প্রবণতা দেখা দিয়েছে কূপমণ্ডুক হওয়ার।

নগ্নপদ ডাক্তারের মতো গ্রামে ফিরে যাওয়ার একটা আওয়াজ উঠেছে। সে সময়ের গদ্যে ও পদ্যে যে জন্যে এক গ্রাম্য কোলাহল শুধু। অনেকেই রবীন্দ্র বিরোধিতার নামে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। কী কবি কী প্রবন্ধকার কী গদ্য লেখক। বুদ্ধদেব একই সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্র-বিরোধী ও গবেষক। সমালোচনা করে তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছেন। যদি ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না ঘটত তবে হয়তো সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথেই তিনি আত্মসমর্পণ করতেন। পাশাপাশি বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছু ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার অনুবাদ করেছেন। বিষ্ণু দে টি. এস. এলিয়টের উপর দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল না আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য ও সাহিত্য এখানে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করবে, এ পথেই বাংলা সাহিত্য আরেকবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হবে। সেজন্যে একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কবি ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র মুছে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। বিষ্ণু দের 'আশাবাদ' বা এলিয়ট প্রমুখের আলোচনার কোনো প্রভাব নেই এ সময়ের সৃষ্টিশীল কবিদের মনে। পাঠকরাও ভুলে গেছে বা পাশ কাটিয়ে এসেছে। বুদ্ধদেবকে পাশ কাটিয়ে আসা যায়নি; ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলা ভাষায় আধুনিকতার উৎস তিনি। কোনো শৌখিন বিদেশি বইয়ের পাঠকের মতো নয়, নয় কোনো কৃতিত্ব অর্জনের লোভ, সীমাহীন আত্মতাড়না তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার কাছে। তিনি মুক্তি খুঁজছিলেন। তাঁর পক্ষে নিছক রবীন্দ্রানুসারী হওয়া সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না সাম্যবাদী আশাবাদের হুজুগে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না গোটা বিশ্বসাহিত্যকে ভুলে গিয়ে একজন নিছক গ্রাম্য ঔপন্যাসিক বা কবি হওয়া। একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে তিনি বোদলেয়ার পড়েছিলেন। একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদিকে ডস্টয়েভস্কি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। জীবন ও সময়—এই দুইয়ের ভবিষ্যৎ প্রবাহকে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে। যা তাঁর সময়ে অন্য কেউ দেখতে পায়নি, তাই কোনো সহজ সমাধানে তিনি বিশ্বাসী হতে পারেননি। তিনি জানতেন বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে-কে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসার জন্য তিনি পুরস্কৃত হবেন না বরং তিরস্কার ও অপবাদই তাঁর জন্য বরাদ্দ হবে। হয়েওছিল তাই, তাঁকে অবক্ষয়ী, সাংস্কৃতিক শ্রেণীশত্রু, পশ্চিমি পচা লা সাহিত্যের আমদানিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল নির্বোধ রাজনীতিওয়ালাদের তরফ থেকে। তাতে তাঁর দুঃখ ছিল না, তিনি ঈপ্সিত মুক্তি ততদিনে পেয়েছেন। মুক্তি ঘটেছে বাংলা সাহিত্যের। নতুন আরেক অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে।

চেতনা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হয়। হয়তো সময় লাগে, কোথাও দীর্ঘ যুগ পরে, কোথাও দ্রুত চলে আসে। নতুন ও জীবন্ত চেতনা প্রবাহিত হওয়ার বাধা শুধু মহাসাগর, মরুভূমি ও মাথা উঁচু পর্বতমালাগুলো নয়। চেতনা বাধা পায় একেকটি জাতির অন্ধতা, রক্ষণশীলতা ও অহংসর্বস্বতার বদ্ধ দেয়ালে এসে। এক একটি জাতি পুরনো ও মৃত চেতনার শবদেহকে আঁকড়ে ধরে রাখে প্রাণপণ, নতুনকে দেখে

চিৎকার করে ওঠে। তবু প্রাকৃতিক নিয়মেই সে আসে, অধিকার করে নেয়, মৃতদের অপমানিত করে। হয়তো বুদ্ধদেবও ভাবতে পারেননি, কলকাতা থেকে সাত/আটশো মাইল দূরে এক গঞ্জ—যেখানে রয়েছে পাগল, ভিখারি, মাতাল ও অসমর্থিত গণিকা; সেই গঞ্জ থেকেও দু-মাইল দূরের এক নিস্তব্ধ ও গভীর গ্রামের এক সদ্য তরুণ তার খড়ো চালার ঘরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে বোদলেয়ারকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভয়ের সঙ্গে আর ভালোবাসার সঙ্গেও। আবেগে তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। কবির সঙ্গে কথা বলার আগে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে, চোখের দিকে। আমারও কোনো বন্ধু ছিল না, থাকা সম্ভব নয়, যাকে ডেকে এনে পরিচয় করিতে দিতে পারি আমার নতুন অতিথির সঙ্গে। পরিবারে যারা ছিল, সেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী—যারা থেকেও নেই, তাদের কাছেও এ অতিথির কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি শুধু আমার, একান্তভাবে আমারই। লণ্ঠনের আলোয় আমরা মুখোমুখি বসি।

এই প্রথম এমন একজন কবির মুখোমুখি আমি, যার কোনো শৈশব নেই। শৈশব, প্রকৃতি ও আনন্দ—যার কবিতায় নেই। অথবা এসবই আছে, ভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়ে। মাতৃগর্ভ থেকে কোনো শিশু নয়, জন্মগ্রহণ করেছে এক যুবক, জন্মাবার পর সে তার বিষাদগ্রস্ত দু-চোখ ফিরিয়েছে অচেনা রমণীটির জন্মযন্ত্রণার দিকে। একবার মাত্র দেখে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরের অন্ধকার পৃথিবীতে, দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে, উপরে আকাশ নীচে নারকীয় ফোঁপানি ও উল্লাস। অন্ধকারকে চম্‌কে দিয়ে ঝলসানো পোশাক পরা নারীর দল চলেছে, চলেছে গর্বিত, মত্ত ও আত্মপীড়ক পুরুষের দল। এই অন্ধকার পথ হয়তো বা প্যারিসের, হয়তো কলকাতার কিংবা কোচবিহারের মতো দূর একটি মফস্‌সল শহরের।

নিজেকে প্রশ্ন করি, তোর কি শৈশব বলে কিছু ছিল? উত্তর পাই না। যতবার শৈশবের কথা ভাবতে চাই, বিস্মৃতি এসে গ্রাস করে নেয়। আসলে শৈশব বলে কিছু ছিল না, কত কমবয়সে জেনে গেছি, বুঝে গেছি। শৈশবে যৌবন, যৌবনে বার্ধক্য—না, শৈশব যৌবন বার্ধক্য বলে কিছু নেই। আছে জ্বলে ওঠা আর নির্বাপিত হওয়া। আছে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার আকুলতা আর গলিত ও স্খলিত সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে না-পারার অন্ধকার। আছে রহস্যময়তা, বিশৃঙ্খলা, আর জন্মের জায়গায় বসে আছে মৃত্যু। জীবনকে কোলে নিয়ে বসে আছে মৃত্যু। শুরু না হতেই শেষ। উল্লাসে জ্বলে উঠেছিল একদিন—এক মুহূর্তের জন্য হয়তো, এখন তার সামান্য ও অবশিষ্ট স্ফুলিঙ্গটি অন্ধকারকে জ্বালিয়ে রাখছে কিছুক্ষণ। এই স্ফুলিঙ্গও মুছে যাবে। কবির মুখোমুখি বসে আমি মেনে নিতে পারি না তাঁর 'পাপ' সম্পর্কে উচ্চারণ। এ যেন সনাতন ধারণারই প্রকাশ। তিনি তো খ্রিস্টীয় নীতিবোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। তাহলে এই 'পাপচেতনা' কেন? কেন এই নিঃশব্দ আর্তনাদ? কেন?

ফিরে আসি 'অচেনা মানুষে'—সেই ভূমিকা কবিতায়, যা পরিণত বয়সে, শেষ পর্বে লিখেছেন তিনি।

তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।

বন্ধুত্বের অর্থ আমিও খুঁজতে যাইনি। খুঁজতে চাইনি। সঙ্গী হিসেবে জীবনের বিভিন্ন বাঁকে কেউ কেউ এসেছে। প্রথমে আড়ষ্টতা, পরে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা, যেন মনে হয়েছে এই আমার বন্ধু—চিরকালের। আমি যা বলি গলগল করে, আমার অনুভব, অভিজ্ঞতা আর আঘাত পাওয়ার কথা—সে শোনে। মনে হয়, সে বুঝতে পারে আমাকে, আমি বুঝতে পারি তাকে। মনে হয়, সে চিন্তা করতে পারে, আছে তার চেতনা, আমার সৃষ্টির সে মূল্য দেয়। কম বয়সের এই ধারণা একদিন ভেঙে চুরমার হয়। সামান্য কথায়, সামান্য কোনো বিচ্যুতিতেই বোঝা যায়, যাকে বন্ধু বলে ভাবা হয়েছিল সে প্রতারক। এতকাল আমার কথা সে কিছুই বোঝেনি, উপহাস করেছে ভিতরে ভিতরে। হাসাহাসি করেছে আড়ালে। চিন্তা চেতনা কিছুই ছিল না তার, শুধু ভান করে গেছে। যাকে বন্ধুত্ব ভেবেছি, সে এক বড় মিথ্যা। ওই শব্দের অর্থ প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে কি রহস্যময় নয়? আর যে কবি, সে যে কতবার দূর থেকে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু পারে না। সে অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার চিন্তার জন্য কল্পনা ও সৃষ্টির জন্য। মানুষ কবিতা চায় কিন্তু ওই তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ও গুহাগহ্বর সমন্বিত হতভাগ্য কবিকে নয়।

তোমার দেশ?
জানিনা কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে—দেবী তিনি, আমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।

স্বজনহীন, বন্ধুহীন, দেশহীন অচেনা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সৌন্দর্যের সামনে। নারী-সৌন্দর্যের সম্মুখে। নিসর্গশোভার কাছে। বিশ্ব সৌন্দর্যের মুখোমুখি। অন্ধ আবেগে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে গেছে সে। কিন্তু তার মূর্ছিত দেহ পড়ে আছে ধূলায়। জ্ঞান ফিরলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে গেছে সে অন্য পথে। চলে গেছে পানশালায় মুহূর্ত আনন্দ ও ক্ষণিক গণিকার কাছে। অথবা এক মুহূর্ত সৌন্দর্যের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে সে চলে গেছে গলিপথে। সৌন্দর্যকে ভালোবাসার শক্তি তার ছিল। সেই অমরা-কে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে গেলে তাকেও হতে হয় অমরত্ব প্রয়াসী। হতে হবে আরেকজন হোমার কিংবা দান্তে। হতে হবে ব্যাসদেব কিংবা কালিদাস। যা এই সময়ের একজন কবির কাছে হাস্যকর। বোদলেয়ারের কাছে লজ্জাজনক। ধ্রুপদি সৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। তাঁর পথ বিপরীত দিকে। আর কাঞ্চন? কাঞ্চন এক পরিহাস। যেমন ঈশ্বর, অগণিত অবোধ সাধারণের কাছে। বোদলেয়ার অচেনা মানুষটিকে তুলে এনেছেন আকাশে, রূপান্তরিত করেছেন চলিষ্ণু

মেঘে, মেঘামালায়? মেঘ-কে ভালোবেসে সে তার মতোই ভ্রাম্যমাণ।

বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালবাসো তুমি?
আমি ভালবাসি মেঘ...চলিষ্ণু মেঘ...ঐ উঁচুতে...ঐ উঁচুতে...
আমি ভালবাসি আশ্চর্য মেঘদল!

আজকের 'অদ্ভুত অচেনা মানুষে'-র ঊর্ধ্বের ওই চলিষ্ণু মেঘও আর প্রেরণাদায়ক নয়। নিজেকে ওই উঁচুতে তুলে নিতে, সঙ্গী হতে পারে মেঘমালার, ভালোও বাসতে পারে সামান্য সময়ের জন্য কিন্তু তাকে নীচে নেমে আসতে হয়। ওই সংঘাতময়, বিদ্যুৎবাহী, বৃষ্টিভারানত ও বজ্রগর্ভ মেঘপ্রবাহ তার সঙ্গী নয়, কেউ নয় বরং সে উৎসাহ পায়, প্রেরণা নিতে পারে নিষিদ্ধ দেশের অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে মদ জুয়ার আসরে এসে।

বিবর্ণ চেয়ারে ব'সে বয়োবৃদ্ধ বারাঙ্গনারা—
পাংশু মুখ, আঁকা ভুরু, মর্মান্তিক বিলোল চাহনি;
উৎকট কামুক ভঙ্গি শীর্ণ কানে যেই দেয় নাড়া,
বেজে ওঠে ধাতু আর পাথরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

সবুজ টেবিল ঘিরে ওষ্ঠহীন বদনমণ্ডল,
বর্ণহীন ওষ্ঠাধর, দন্তহীন কঠিন চোয়াল;
এবং অঙ্গুলি, যেন নরকের বিকারে বিহ্বল,
হাৎড়ে ফেরে পকেট, বুকের খোপ, উদ্বেগে উত্তাল।

যে রাত্তিরে আমি আন্‌কোরা গ্রন্থের গন্ধে ভরা লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় কবির মুখোমুখি, তার দু-দিন আগের এক রাতে এরকম আসরে উপস্থিত ছিলাম। আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি ছিলাম পীনু জুয়াড়ির সঙ্গী, পীনু সেই প্রথম গণিকাপল্লির অভ্যন্তরে এক জুয়ার ঠেকে নিয়ে গেল আমাকে, যার দুজন খেলুড়ে মধ্যবয়সি গণিকা, দুজন প্রায় বৃদ্ধ পুরুষ। পীনুর ছিল সব চুল শাদা, মুখগহ্বর দন্তহীন কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অকালে সে নিজেকে বৃদ্ধে পরিণত করেছিল—সর্বনাশে একজন নৈষ্ঠিক পুরুষ হিসেবে। আমি তাকে ঈর্ষা করতাম, ভাবতাম আমি কোনোদিনও তার উচ্চতায় উঠতে পারব না। অন্য পুরুষটি ছিল একচোখ কানা শীর্ণকায় রোগাক্রান্ত ও খানিকটা কুঁজো, বৃদ্ধ। দেখে মনে হয়, এখানে সে সব কিছু খুইয়েছে, হয় কোনো গণিকার অন্নদাস হয়ে বেঁচে আছে কিন্তু অর্থের লালসা তার এখনও অপরিসীম। স্ত্রীলোক দুটি, ভয়ংকর, একজন স্থূলকায়া অন্যজন কঙ্কাল। মুখে চড়া রং, চুলে কলপ, আঁকা ভ্রূ, চোখে কাজল, কানে লক্‌লকে দুল, ঝল্‌মলে পুরনো দামি পোশাকের সঙ্গে বীভৎস হাসি। আমি মনে মনে নাম দিয়েছিলাম বীভৎস সুন্দরী। ঘরটি ছিল তুলনামূলকভাবে নির্জন ও নিঃশব্দ। বাইরে চিৎকার, কান্না, প্রলাপ, হাস্য ও অশ্রাব্য গালাগালি। বাইরে মাতাল, গণিকা, শিশু দালাল, ফেরিওয়ালা, দোকানি। আমরা যে ঘরে সেখানে—সেই ঘরে কেউ ঢুকছিল না। ঢোকার সাহস ছিল না? হয়তো তাই। পীনুকে

তিরস্কার করল বীভৎস সুন্দরী। আমার মতো ভদ্রগোছের মুখওয়ালা এক নাবালককে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রত্যুত্তরে পীনু হেসে অশ্লীলভাবেই জানাল, এই ছোক্‌রাকে সে তার জন্য নিয়ে এসেছে—তাকে উপহার দিতে। প্রচণ্ড মুখখিস্তি করতে করতেও সে তার দুই সবুজ নেকড়ে চোখ দিয়ে চেখে নিল আমাকে, সে চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল মুহূর্তে। আমাকে বসতে দিল টেবিলের পাশে বীভৎস সুন্দরী, তার ও পীনুর মাঝখানে। আমি খেলুড়ে ছিলাম না, ছিলাম দর্শকমাত্র কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু। আশঙ্কা ও আবেগ আমার মধ্যে তীব্রভাবে কাজ করছিল, অবিশ্যি আমি ছিলাম একেবারে নিশ্চুপ। ওই স্ত্রীলোকদের কাছে এখন কেউ আসে না, তবু তারা সেজেগুজে বয়স ভাঁড়িয়ে সন্ধ্যারাতে বেরয়, কেউ আসবে না জেনেও তারা মদ আনে—জুয়ার আড্ডায় বসে। খেলা শুরু হল, তাসের জুয়া। মদ এল। দু-একটি কমবয়েসি মেয়ে বা পুরুষ ভুল করেই যেন হঠাৎ সে ঘরে ঢুকে পড়ছিল। ঢুকে পড়ে কয়েক পলক স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে— এ কে? এ এখানে কেন? বীভৎস সুন্দরী তার তীব্র কটাক্ষে সেই অবাঞ্ছিতদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল দরজার বাইরে। মদ দেওয়া হয়ে গেলে উঠে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে দেয়।

> সবুজ টেবিল ঘিরে ওষ্ঠহীন বদনমণ্ডল,
> বর্ণহীন ওষ্ঠধর, দন্তহীন কঠিন চোয়াল;

টেবিল সবুজ ছিল না, ছিল লাল। লাল একটি অয়েলক্লথ পাতা ছিল টেবিলে। 'ওষ্ঠহীন বদনমণ্ডল' আর 'বর্ণহীন ওষ্ঠধর' ছিল নারী দুটির, আর কঠিন চোয়াল পীনুর। অন্য পুরুষটির। এবং বেশ্যা দুজনেরও চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল প্রতিটি তাস তুলে নেওয়ার সময়ে। আমি সদ্য স্মৃতি থেকে তাদের দৃষ্টি, অঙ্গ সঞ্চালন, ঝুঁকে পড়া, এমনকী লম্বা ও ছোট নিঃশ্বাস টানাকেও তুলে আনতে পারছিলাম। শুধু সপ্তম পংক্তিতে এসে একটু ছোট ধাক্কা :

> এবং অঙ্গুলি, যেন নরকের বিকারে বিহ্বল,

হ্যাঁ, আঙুল। যখন তারা তাস নামিয়ে রাখছিল পরস্পরের দিকে ক্রূর চোখে তাকিয়ে, যখন তারা অর্থ এগিয়ে দিচ্ছিল বা তুলে নিচ্ছিল নিচু হয়ে তখন তাদের আঙুল যেন আর তাদের ছিল না, অন্য আলোতে ঝলসে উঠছিল। কী ক্ষীপ্র বা মন্থর, লুব্ধ বা নিঃস্ব আঙুল। কিন্তু সেই আঙুল কী ছিল, 'যেন নরকের বিকারে বিহ্বল'। এই নরক শব্দটি আমাকে থম্‌কে দেয়, মুখ তুলে তাকাই সামনের দিকে। নরক—বহু ব্যবহৃত এই শব্দটি আমাদের দূর স্মৃতিকে একবার জাগিয়ে দিয়েই দ্রুত মিলিয়ে যায়। বস্তুত, নরক, শয়তান, পাপ এ শব্দগুলো আমাদের বহুদূর অতীতের সুন্দরী মাতামহীদের মতোই মনে হয়। যাদের সৌন্দর্য আভিজাত্য ও লাম্পট্য বা ব্যভিচার কিংবদন্তি হয়ে আছে, তবু এখনকার জীবন যা অচল। সত্যি, সেদিন সেই গণিকা ও মাতালদের জুয়ার আসরে বসে আমার একবারও নরকের কথা মনে হয়নি, পাপের কথা মনে হয়নি। নিষ্ঠার সঙ্গে, উল্লাসের সঙ্গে নিজেকে ধ্বংস

করছে তারা, আমি প্রত্যক্ষ করেছি। প্রত্যক্ষ করেছি, সে আঙুলগুলো মানুষেরই। শুধু তা মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে।

পাপ, শয়তান, নরক...বোদলেয়ারের কবিতা, ভাবনা পৃথিবীর চাবিকাঠি। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আমৃত্যু যুদ্ধ করেছেন বোদলেয়ার, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন আবার তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। যেমন ডস্টয়েভস্কি। পাপের উপাচার দু-হাতে তুলে ধরে, সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে, শয়তানের সহাস্য আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বনিখিল স্রষ্টার কাছে। পুণ্যের পথ নয়, পাপের পথই জীবন্ত পথ, সেই দূর কৈশোরে প্রথম যখন ছিট্‌কে পড়লাম মৃত্যু-উত্তপ্ত-জীবনধারায়, অপরিশীলিত অনুভূতি দিয়ে বুঝলাম, গণ্ডিবদ্ধ জীবনের অসারতা থেকে একবার যারা বাইরে বেরিয়ে এসে এই জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে—জীবন নয়, মৃত্যুর স্বাদ, তার পক্ষে আর ফেরা সম্ভব নয়। ওখানে মৃত্যু শিক্ষক, হতভাগ্য ছাত্ররা বেঁচে থাকার মূল অর্থ তার কাছ থেকে জেনে নিতে চায়।

যদিও বোদলেয়ারের নরক দান্তের নরক থেকে ভিন্ন। দান্তের নরক প্রাচীন পুথি থেকে উঠে এসেছিল, বোদলেয়ারের নরক মানবিক ও আধুনিক। আমাদের পরিচিত। বোদলেয়ারের শয়তানকে এক চরম মানুষ, এক কালো আত্মা বলেই আমার মনে হয়েছে। জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো পরবর্তী সময়ে এই শয়তানকে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি ও জীবন নিবেদন করেছেন। মরণ যার বৃদ্ধা প্রণয়িনী, যার গর্ভে তিনি আশার জন্ম দিয়েছেন। সে তো মানুষই, বই হাতে নিয়ে আমি ভাবি, সমগ্র বিদ্রোহী মানুষের চেতনা দিয়ে গড়ে তোলা একটা মানুষ—সেই কি শয়তান? মানুষ ক্ষীণ আর দুঃখী বলে, লবণ আর গন্ধক মিশিয়ে তাকে শিখিয়েছেন গোলাগুলি বানাতে। মেয়েদের চোখ ও মন এমনভাবে জাগিয়ে তুললেন, যাতে তারা জঞ্জালেও ভালোবাসা বিলিয়ে দিতে পারে, আরতি করতে পারে আঘাতকারীকেই। মানুষের কাছে ঈশ্বর দূরের, অবাস্তব ও বিমূর্ত। শয়তান বাস্তব, মূর্ত ও কাছের। হাজার বাধানিষেধের মধ্যে গোপনে তাকেই ভালোবাসে। আর যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষের কাছে মিথ্যা মনে হল, তখন পাপের সেই স্বাদ যেন নেই আর। যখন পাপকে পাপ বলে মনে হল না তখন তারা দিশেহারা। পাপ না থাকলে পরিণামে শাস্তি, দুঃখ ও যন্ত্রণা যে থাকবে না! অন্ধকার পৃথিবীর মানুষ যেন নিজেদের পাপী ও দুঃখী ভাবতে বদ্ধপরিকর। আধুনিক সাহিত্যের ধারা বেয়ে ডি. এইচ. লরেন্সে আমি দেখি, লরেন্সের নায়িকা তার সদ্যমৃত স্বামী ও প্রেমিকের নগ্ন শরীরের সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মোচন করছে। সে প্রত্যাখান করছে, দ্বিধাহীনভাবে জানিয়ে দিচ্ছে এই মৃতদেহ আমার কেউ নয়। কোনোদিনই কেউ ছিল না। তারা ছিল আলাদা দুটি সত্তা, পাশাপাশি বহমান, প্রাকৃতিক নিয়মে মিলিত হয়েছে কখনও, সন্তান উৎপাদন করেছে, আবার সরে গেছে। এখানে পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক শয়তান ভগবান কিছু নেই। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হল যেন। আধুনিক সাহিত্য মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে পারল...

তবু বিশ্বাস আজ, নরকের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ঐখানেই শেষ
হ'লো না। সে নরক ছিল ভাল, প্রাচীন, তার দরজা খুলেছিলেন
মানুষের মহান সন্তান। —জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো

খ্রিস্ট জন্মের বহু ওপার থেকে, সেই আদিম মানুষের মনের প্রথম উন্মেষ থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে পাপচেতনা। পশুর মন নেই, পাপও নেই। মনহীন আদিম মানুষেরও কোনো পাপ ছিল না। তার মনের জন্ম, পাপের জন্ম প্রায় একসঙ্গে। আর পাপের উৎস কাম। পাপ— কামের, কামার্ততার। তার জন্য দায়ী করল নারীকে। নারীরাও ভেবে নিল, তারাই নরকের দ্বার। তারাই দায়ী। কাম থেকে—নারী থেকে—শুরু হ'ল নরক, আর্তনাদ, যন্ত্রণা, চিৎকার আর তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। পরিত্রাণ নেই, মুক্তি নেই, পরিণামে আছে মৃত্যু। সে মৃত্যু ভয়াবহ, বীভৎস ও অমোঘ। যদি জন্মমাত্রই পাপ, পাপের পরিণাম মৃত্যুই যদি হয়—তবে এসো মানুষ ও মানুষী আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেখি পাপের অতল স্পর্শ করতে পারি কিনা, এই রহস্য ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে পারি কিনা। অবধারিত কুৎসিত মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি কিনা।

এই পাপ ও মৃত্যুচেতনার উপর দাঁড়িয়ে আছে মানুষের ধর্মীয় ভাবনা ও ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সংগীত, কবিতা, ভাস্কর্য ও শিল্পকলা, সাহিত্য ও কাব্য— বিশাল সৌধের মতনই মাথা তুলে আছে। এখান থেকে জন্ম নিয়েছে আকাশগঙ্গা ও কালো স্রোতের নির্মম নদী। বোদলেয়ারে আমি সেই স্রোতোধারা দেখি, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করি। কবি সেই দুজনের একজন, যিনি প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে না গিয়ে নগরপ্রান্তের অধুনাতম এক জীবন্ত অংশে, তাকে জীবন দিয়ে জানতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন জীবন কী? জীবনের পথ কোন দিকে...

আজ প্রায় প্রতিটি সচেতন মানুষই বিশ্বনাগরিক। অন্তত তার তাই হওয়া উচিত। গোটা বিশ্বের ঘটনা দুর্ঘটনা, নানা আলোড়ন ও আঘাত তাকে আন্দোলিত করে। একটি মানুষ যেমন তার নিজের জাতির বা দেশের পরিবারের বা সম্প্রদায়ের তেমনি সারা বিশ্বেরও। তবুও সাধারণের অন্ধতা এখনও কাটেনি, সচেতন হয়েও সে গোষ্ঠীগর্ভে মুখ গুঁজে থাকতে ভালোবাসে। ভালোবাসে নিশ্চেতনায় গা ভাসিয়ে দিতে। অন্ধতাকে সে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে। স্রষ্টার আজ আর সেটুকু সান্ত্বনাও নেই। যে কবি বা স্রষ্টা যে অঞ্চলে রয়েছেন সেখানকার উপাদান ও আগুন নিয়ে তাকে সৃষ্টি করতে হবে বিশ্বমানের কবিতা বা শিল্পকর্ম, সে ছবি, সংগীত, উপাখ্যান, নৃত্য, নাটক যাই হোক না কেন। তার আর কোনো দেশ, জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় কিছু নেই। ছোট-ছোট আশ্রয়গুলোকে সে নিজেই ভেঙে দিয়েছে, গুঁড়িয়ে দিয়েছে বড় একটি আশ্রয় পাবার আশায়। সেই বৃহত্তর আশ্রয় যদি তার নাও জোটে তাতে দুঃখ নেই, ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সে যে

পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়াতে পেরেছে, এটাই বড় একটি ঘটনা। আজও গ্রাম্য ও আঞ্চলিক মানের গদ্য-পদ্য-নাটক-গান তৈরি হয়। তারা জনপ্রিয় হয়, পুরস্কার পায়, তারপর ঝরে পড়ে। এরা তাদের সংকীর্ণতায় তৃপ্ত। কিন্তু এরা বা এসব লেখাপত্তর প্রাসঙ্গিক নয় আর আমাদের কাছে। এই লেখা শুরু হয়েছিল দুজন কবি বন্ধুর (!) কথা দিয়ে, একজন চলে গেল সহজ সাফল্যের দিকে—রাজসভা আর অশিক্ষিত পাঠকভিড়ের দিকে। অন্যজন পা বাড়াল তার বিপরীত দিকে, তার আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছিল বলে; সে পৃথিবীর সুর শুনতে পেয়েছে। বুঝে গিয়েছিল তার মাথার উপর আকাশ, নীচে মাটি; আর পথ জুড়ে অন্ধকার। বিশ্বের যে-কোনো অঞ্চলের যে-কোনো ভাষার বিশ্বমানের স্রষ্টার সঙ্গে সে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে। দুর্গম বা দুর্বোধ্য ভাষা তার কাছে অন্তরায় নয়। সে জানে তার জন্য অপেক্ষা করছে অপরিচয়ের অন্ধকার, অখ্যাতি, অবজ্ঞা ও অবহেলা আর লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো সরাইখানার পেছনে স্যাঁতস্যাতে নোংরায় আবর্জনাস্তূপে অপরিচিতের মৃত্যু। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, মৃত্যু। তবু সে আর ফিরতে পারে না। ফেরা সম্ভব নয়।

আজকের স্রষ্টা অনেক দূর—অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছে। তার কাছে পাপ চেতনা বাহুল্য মনে হয়, ধ্রুপদি স্বর্গ ও নরক তাকে আলোড়িত করেনি। এসব বিষয় তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কাম থেকে পাপ, পাপ থেকে উদ্ভূত নরক ও পরিণামে মৃত্যু তাকে ভাবায় না। কাম তার কাছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, পুরুষের কাছে নারী, নারীর কাছে পুরুষ—আজ সম্পূর্ণ নগ্ন ও পাপহীন, যদিও রহস্যময়। কাম নেই, পাপ নেই, স্বর্গ নেই, নরক নেই—কিন্তু মৃত্যু আছে। মৃত্যুর তীব্র আকর্ষণও আছে। আজ একজন শিল্পীর নৈতিকতা অন্য এক জায়গায়। নির্বোধ সমাজ, নির্মিত ও নিপীড়ক রাষ্ট্র ও ভুল আদর্শবাদকে লঙ্ঘন করাকে সে অন্যায় বা অনৈতিক মনে করে না। অন্যায় মনে করে এমন কিছু, যা নিয়ত মানুষকে দূষিত করেছে—তাকে আত্মহীন করছে, তাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে। সে সেই সমাজকে বর্জন করে—যাঁরা বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের অসাড় করে তোলে, যারা গণ্ডিবদ্ধ ও মিথ্যা জীবনযাপন করে। সে যায় সেখানে, মৃত্যুর কাছ ঘেঁষে কোল ঘেঁষে যারা আছে তাদের মধ্যে—সেই

> ...এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে জাগে রান্নাঘর
> এখানে-ওখানে; অর্কেস্ট্রা উল্লাসে; ওঠে তারস্বর
> রঙ্গমঞ্চে, আর শস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
> ফূর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা মাতাল, জোচ্চোর,
> তার সাকরেদ যত; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
> প্রতিশ্রুত; ...

মগ্ন হও, এ-গম্ভীর লগ্নে তুমি মগ্ন হও, মন,
ভাবনায়; রুদ্ধ করো কর্ণদ্বার; এই সেই ক্ষণ,
যখন রোগীর দুঃখ তীক্ষ্ণ হয়; অন্ধ কালো রাত
আঁকড়ে তাদের কণ্ঠ; ...
উপরন্তু অনেকেই বোঝেনি, জানেনি কোনদিনই
গৃহকোণে মধুময় শান্তি; এরা কখনো বাঁচেনি।

অথবা এরাই বেঁচেছে, অন্যরা বাঁচা কী তা জানে না। কবি তার নিজের কাছেই এসেছেন। তার অন্তরের জীবন্ত মূর্তি প্রতিমাগুলোর কাছে, তার একান্ত আপন ও নিজস্ব জীবনের কাছে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে পথ, জীবনের পথ।

ঢালো সে গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা!
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন!
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন!

১৯৮৫

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো : আজকের প্রাসঙ্গিকতা

......

র‍্যাঁবো—হ্র্যাম্‌বো—খ্যাম্‌বো। জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো-র নামের বিতর্ক শুরু হয়েছে তাঁর জন্ম শতবর্ষের (১৯৫৪) দশ কী বারো বছর পর থেকে। বিতর্ক আজও চলছে। এপার বাংলার এক কবি, বিদেশি কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে লিখলেন, র‍্যাঁবো নয়, উচ্চারণটা হবে হ্র্যাম্বো। ১৯৯১-এ, র‍্যাঁবোর মৃত্যুশতবর্ষে ওপার বাংলার আর এক কবি বললেন, র‍্যাঁবো বা হ্র্যাম্বো কোনোটাই নয়, হবে খ্যাম্‌বো। এই বিতর্ক বাংলা ভাষার পাঠকের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা যারা তাঁর পাঠক, যাদের কাছে র‍্যাঁবো উচ্চারণটাই শতাব্দী পেরিয়েও সমান প্রিয়, হ্র্যাম্বো বা খ্যাম্‌বো নয়, আমরা তাঁকে জানি জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো বলেই। যেভাবে, ইউরোপ আমেরিকার পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ 'টেগোর' নামেই পরিচিত, আজ যদি 'টেগোরে'র জায়গায় 'ঠাকুর' জোর করে চাপানোর চেষ্টা হয়, তাতে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ শুধু কৌতুক অনুভব করবেন মাত্র।

নাম উচ্চারণ-বিকৃতির উল্লেখের কারণ একটা রয়েছে। র‍্যাঁবোর নাম নিয়ে যতটা উৎসাহ দেখানো হয়েছে, তার সিকিভাগও তাঁর লেখালেখি বা জীবনধারা নিয়ে হয়নি। না, তেমন কোনো গভীরতর আলোচনাই হয়নি বাংলাভাষায়, দেওয়া হয়েছে শুধু র‍্যাঁবো সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাদ। খুব সম্ভব, লোকনাথ ভট্টাচার্য অন্য কয়েকজনের সঙ্গে র‍্যাঁবো বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তা সামান্য ও সংক্ষিপ্ত, অসামান্য এই প্রতিভার প্রতি অবিচার। অথচ বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো আমাদের ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছেন যে তাঁদের বাদ দিয়ে আমরা বাংলা কবিতাকে ভাবতে পারি না।

দুই

আমার বয়স তখন উনিশ। পৌনে দুশো কবিতা আমার লেখা হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে পনেরো ষোলোটি বাদে বাকিগুলো নষ্ট করেও ফেলা হয়েছে। না ছিঁড়ে ফেলা নয়। কবিতার খাতাই বেচে দিয়েছি মুদি দোকানে। এজন্য কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই, ছিল না। শুধু কবিই নয়, আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বকনিষ্ঠ তরুণ সদস্য। জেলা শহরের পার্টি অফিসে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে গম্ভীরভাবে আসি, বয়স্ক কমরেডদের সঙ্গে পার্টির তাত্ত্বিক দিকটা নিয়ে আর পার্টির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলি। বেশ গুছিয়ে ধীর স্বরেই

বলতে চাই কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠি এবং গল্‌গল্‌ করে বলে ফেলি, আমার বক্তব্য। আর তর্ক জুড়ে দিই। বয়স্কদের গোঁড়ামি ও কৃত্রিমতাকে আঘাত করি, ওঁরা ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। আমি এর মধ্যেই আরও উপরের স্তরের নেতাদের প্রশ্রয় পেয়ে গেছি। সে যাই হোক ওরকম এক তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়লাম, রাজ্যস্তরের এক ইন্টেলেকচুয়াল ও প্রায়-সাহিত্যিক নেতার সঙ্গে। তিনি আমাকে আধুনিক কবিতা সাহিত্য নিয়ে খোঁচা দিয়ে থাকবেন, আমি রুখে উঠি। অবশেষে তিনি রেগেমেগে বলেন, জানো, র‍্যাঁবো শেষ জীবনে কী করেছে?

কী? আমি প্রশ্ন করি।

ক্রীতদাসের ব্যবসা। আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে ধরে, জাহাজ বোঝাই করে চালান দিত ইউরোপ আমেরিকায়...এই তো তোমাদের আধুনিক কবির চরিত্র...

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো, নামটির সঙ্গে আমি পরিচিতি কিন্তু তখনও তাঁর কোনো কবিতা বা গদ্য পড়িনি। জানি না তাঁর জীবনে কী কী ঘটেছিল। শুধু শুনেছি ফরাসি দেশের দুরন্ত বিস্ময় বালক জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো, যিনি সতেরো বছর বয়সে তাঁর লেখালেখি শেষ করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন এবং নানা দুর্ঘটনা দুর্ভোগের মধ্যে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। সেই পার্টি-নেতার মুখের ওপর কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু, বুঝেছিলাম এই শ্রেণীর লোকেরা যে কবি বা শিল্পীর, লেখক বা গায়কের নিন্দেমন্দ করবে, তারাই সত্যিকারের সজীব ও প্রতিভাবান, তারাই প্রাসঙ্গিক। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশাল একটা অংশ পার্টির মধ্যে ঢুকে সারা বিশ্ব জুড়েই গ্যাঁট হয়ে বসে গিয়েছে, আমি বুঝে গিয়েছিলাম। আমি র‍্যাঁবোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। আর পেয়েও গেলাম।

সময়টা ১৯৬১। র‍্যাঁবোর জন্মের ১০৯ বছর পর। স্থান, পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক এক মফস্‌সল শহর। আধা গ্রাম-আধা শহর। আর পাত্রটি আমি; স্বপ্নে-আবেগে-প্রচণ্ড জেদে ঠাসা গ্রাম্য এক মুখচোরা সদ্যযুবক।

তিন

র‍্যাঁবো হাতে নিয়ে আমার রোমহর্ষই হয়। প্রথমেই পাতা উল্টিয়ে পড়তে পারি না। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সামনের ও পেছনের মলাট দেখে ঝোলায় রেখে দিই। তাঁকে নিয়ে রওনা হই দূর গ্রামের পার্টি মিটিং-এ। যেখানে মিটিং শেষে এক দিনমজুরের বাড়িতে রাত কাটাতে হবে। সেখানেই আমরা মুখোমুখি বসব, ভাবি। আমি আর র‍্যাঁবো।

অর্থাৎ সতেরো বছরের জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো-র মুখোমুখি উনিশ বছরের এক বাঙালি সদ্যযুবক। জায়গাটাও অদ্ভুত। হতদরিদ্র সোমারু বর্মণের কুঁড়েঘরের বাঁশের মাচা। খড় বিছিয়ে, খড়ের ওপর বস্তা, বস্তার ওপর পুরনো একটা শাড়ি পেতে আমার জন্য রাজকীয় বিছানা করা হয়েছে, আমাকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ শিস্‌ ওঠা তোবড়ানো একটি কেরোসিন

কুপি। নীচে, মেঝের ওপর আরেকটি খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে সোমারুর একমাত্র শিশু সন্তান। তার স্ত্রী তখন রান্নাঘরে শুট্‌কি মাছের উপাদেয় ব্যঞ্জন রান্নায় ব্যস্ত। সোমারু আকণ্ঠ তাড়ি পান করে একবারের জন্যে বাড়ি আসে, রাত এগারোটায়। আমাকে বইপত্রে মুখ ডুবিয়ে থাকতে দেখে, ধরে নেয় আমি পার্টির কোনো দুরূহ তত্ত্বে নিবিষ্ট। কালো হাঁড়িতে আমার জন্য কিছুটা সাদা পানীয় রেখে বিদায় নেয়। জানিয়ে যায়, সে আর রাতে ফিরছে না। আজ রাত্রির জন্য বউ-বাচ্চার ভার কমরেডের ওপর। আমাকে কোনো প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়ে অন্ধকারে নেমে যায় সে। সত্যি কথা কী, সে রাতে সঙ্গে র‍্যাঁবো না থাকলে একই ঘরে প্রায় একটা খড়ের বিছানায় শুয়ে সোজা সরল সোমারুর কিশোরী স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিযাপন চূড়ান্ত অস্বস্তিকর হত। আমৃত্যু ভ্রাম্যমাণ জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো কি এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন? হয়তো হয়েছিলেন, অন্যভাবে, অন্য দেশে অন্য সময়ে। আমি 'নরকে এক ঋতু'-র তোরণ-দ্বারে। র‍্যাঁবো তাঁর ঈশ্বরের কাছ থেকে, উৎসবের কাছ থেকে, শৈশবস্মৃতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি এসে পড়েছেন শয়তানের আওতার মধ্যে। শয়তানকে বন্দনা করেই র‍্যাঁবোর সৃষ্টির, আত্মভ্রমণের শুরু। একেকটি লাইন পড়ি আর মুখ তুলে চোখ তুলে দরজার বাইরে ঘন ও জমাট অন্ধকারের দিকে তাকাই, তাকিয়ে থাকি। এ সময়েই সোমারুর স্ত্রী সামনে হেসে দাঁড়ায়, সরল ও আদিম হাসি হেসে জানতে চায়, খাবার কি সে ঘরে নিয়ে আসবে না রান্নাঘরে গিয়ে আমি খাব।

আমার শুধু মনে হয়েছিল, সেই বয়সে, র‍্যাঁবোর ঈশ্বর ছিল, ঈশ্বরের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি। ঈশ্বর অনুর্বর। শয়তান উর্বর। শয়তানে, পাপেও দূষিত রক্তে রয়েছে সৃষ্টির উৎস। সঙ্গে অবশ্য রয়েছে সীমাহীন দুঃখ আর নির্যাতনও। কবির তা জানা সত্ত্বেও সেখানেই যেতে হবে। কিন্তু আমাদের যাদের ঈশ্বর নেই, শয়তানও নেই, পাপও নেই, পুণ্যও নেই...তাদের কী হবে?

চার

আজ, পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে, এই ১৯৯৪-এ, শতাব্দী শেষে আবার জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবোর কাছেই আমাকে আসতে হয়। র‍্যাঁবোর যে বিদ্রোহ, তাঁর জন্মের ১৪০ বছর পরও তা সমান প্রাসঙ্গিক। শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, আজ একজন কবি, সৃষ্টিশীল মানুষ জানে তার সময়ের বন্ধ্যাভূমিতে দাঁড়িয়ে, প্রচারসর্বস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে বাস করে আর যাই হোক, সৃষ্টি বুঝি সম্ভব নয়! বোদলেয়ার বা র‍্যাঁবোর সময় যে পরিপ্রেক্ষিত ছিল, আজ তা আর নেই। বোদলেয়ার শয়তানকে উদ্দেশ্য করে স্তোত্র রচনা করেছিলেন, র‍্যাঁবো শুরু করেছিলেন শয়তানকে বন্দনা করেই। ধর্মের সেই বাতাবরণ ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে, নির্মূল হয়ে গেছে আমাদের অভ্যন্তর থেকে। যদিও ধর্মের কঙ্কাল আছে এখনও, আর ওপর থেকে তা চাপিয়ে দেবার এক ভয়াবহ প্রচেষ্টাও চলছে এখনও। তার বিরুদ্ধে কবি বা শিল্পীর আর

করার কিছু নেই। প্রাচ্যের এই অংশে আমরা যারা তথাকথিত হিন্দু তাদের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র বহুকাল আগেই ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ বিদ্রোহ তাই ধর্মীয় পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে নয়, আজ বিদ্রোহ রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক যান্ত্রিকতা সর্বস্ব প্রচার-উত্তাল বিশ্ব-বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে। আজও কবিকে মানুষের মূল খুঁজতে বেরিয়ে পড়তে হয় দূর আদিমতায়, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সভ্যতা, তার যে অংশগুলোতে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে হাজার বছর ধরে, সেখানে। নগ্নতা আজকের বিদ্রোহের প্রাথমিক শর্ত, সম্পূর্ণ নগ্ন না হলে ফিরে পাওয়া যাবে না আমাদের হারিয়ে যাওয়া সংবেদনশীলতা, অনুভূতির আদিম ক্ষমতা, উপলব্ধির প্রথম বিস্ময়। সভ্যতা কৃত্রিমতায় ও যান্ত্রিকতায় সবকিছুকেই জর্জরিত করে ফেলার পর এখন তার থাবা অজ্ঞাত অখ্যাত স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ব্যাক্তিত্বের দিকে, চিবিয়ে থেত্‌লে ও মাড়িয়ে ছিবড়ে করে ফেলে, সে শেষ পর্যন্ত যেতে চায়।

সামগ্রিকভাবে এই অবস্থাটার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। অনাসৃষ্টির থেকে সরে এসে সৃষ্টি, যে সৃষ্টিধারা নানান বাঁকে ক্ষীণস্রোতা হলেও, বহমান। যে সৃষ্টিধারা মানুষকে এই অন্ধকারে ফিসফিস করে বলে যাচ্ছে, তার সত্য-পরিচয়ের কথা। যে সৃষ্টিতে জীবনের সত্য এসে শিল্পের সত্যে মিশে যায়।

তবু আমার মনে হয়, কোথাও ভুল থেকে যাচ্ছে, কোথাও খামতি থেকে যাচ্ছে আজকের বিদ্রোহে, আজকের নতুন সময়ের লেখালেখিতে। অভাব থেকে যাচ্ছে এমন কিছুর যার জন্য দানা বাঁধতে পারছে না, ছাপ ফেলতে পারছে না। প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে বাধা পেয়ে ঝরে যাচ্ছে আজকের অনেক কবিতা, অনেক গদ্য। প্রথমেই যেটি মনে হয়, সেটি হল, আজকের বিদ্রোহের পশ্চাতে কোনো বেদনা নেই। তীব্র জীবনবোধ অনুপস্থিত।

পাঁচ

'আমার যে বড় কষ্ট, আমি যে কাঁদছি—সত্যিই, বড়ো কষ্ট আমার! যদি সবই পেতে পারতাম—আমি জর্জর সেই গ্লানি ও ঘৃণায় যা যোগ্য চরম ঘৃণার্হ হৃদয়ের' 'আমি যে ক্রীতদাস এক নারকীয় প্রেমিকের, বাতুল কুমারীর দল তাকে ত্যাগ করেছে। এই প্রেমিক দৈত্যটি নেহাৎ মন্দ মন। ভূত নন, প্রেত নন, ভ্রম নন। কিন্তু আমি যে হারিয়েছি শান্তি, আমি যে অভিশপ্ত, মৃত জগৎবাসীর কাছে—আমাকে হত্যা করবে না কেউ।'...

[পাগলিনী কুমারী : নরকে এক ঋতু, অনু : লোকনাথ ভট্টাচার্য।[১]]

র‍্যাঁবো তাঁর নিজের সত্তাকে দুই অংশে ভাগ করে নেন। অথবা এই বিভাজন একই অধ্যায়ে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। তার এক 'আমি' হয় উন্মাদিনী কুমারী, অন্য 'আমি' বর্বর প্রেমিক। অথবা আমরা একে প্রতারিত এক কিশোরী কুমারী বলেই ধরে নিতে পারি, যার মধ্য দিয়ে র‍্যাঁবো তাঁর বিদ্রোহী প্রলাপ, উপলব্ধির নির্মম সত্য প্রকাশ করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ—প্রলাপ। চূড়ান্ত সংকট সময়েও সমাজ যখন সুখী আলাপে অসাড়, শুধু

নিজের বাঁচা নিয়ে ব্যস্ত, যখন কে কার আগে যাবে সেই প্রতিযোগিতায় ছিন্নভিন্ন তখন কবির কণ্ঠ থেকে প্রলাপই নিঃসৃত হয় স্বাভাবিকভাবেই। ১৪০ বছর আগে ফরাসি ভাষায় তাই হয়েছিল, ১৪০ বছর পর আজকের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের ভাষাগুলোতে তাই হচ্ছে। সময় পরিবর্তিত হয়েছে, প্রলাপ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, পরিপ্রেক্ষিত এক মুখোশ ছেড়ে আরেক মুখোশ ধারণ করেছে কিন্তু প্রলাপের প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায়নি। আজও মানুষের জীবনের মূল সত্য প্রলাপের মধ্যেই উচ্চারিত হয়।

আজ যে সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা উন্মাদিনী কুমারী পড়ি, সে সময়ে অন্তত একটা পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরা তাদের পরাধীনতা, পরনির্ভরতা আর প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। নারীবাদী আন্দোলনের অনেকটা অবশ্য সেই প্রতারক ও পিতৃতান্ত্রিক পুরুষদেরই বানানো, তাদেরই তৈরি করা এক শৌখিন আন্দোলন হলেও এর মধ্যে যতটুকু সত্য রয়েছে তাতেই এক উজান স্রোতের আবহ সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং অনেক মূল্যবোধও পাল্টে যাচ্ছে। আজকের এই প্রেক্ষাপটে কোনো কুমারী হয়তো আর্তনাদ করবে না, ফুঁপিয়ে উঠবে না, আত্মগ্লানি বা অনুতাপে সে হয়তো পাল্টা আঘাতই করবে। তার বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেবে। তবু র‍্যাঁবোর উন্মাদিনী কুমারী দীর্ঘ প্রলাপ শেষে, কোন্ সত্যকে আবিষ্কার করেছিল, কোথায় এসে পৌঁছেছিল—সেটা আমাদের লক্ষ করার বিষয়।

"এই যে ফিটফাট যুবকটি দেখছো, ঢুকছে নিঃশব্দে সুন্দর বাড়িটির মধ্যে, নাম হয়ত এর দুভাল, দুফুর, আর্মা, মোরিস—কি জানি? এমন পাপী গর্দভটিকে একটি নারী সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল—আজ সে মৃতা, এতোদিনে স্বর্গে নিশ্চয়ই কোনো মুনি-ঋষির আসনে অধিষ্ঠিত। তুমিও আমায় মারবে তেমনি ক'রে যেমন এই লোকটা মেরেছে সেই নারীকে। আমাদের মতো যারা সহৃদয় তাদের নিয়তিই এই।" [অনু : লোকনাথ ভট্টাচার্য]

সে তার পুরুষটিকে, প্রেমিককে অবশেষে চিহ্নিত করতে পেরেছে 'পাপী গর্দভ' হিসেবে। কিন্তু নিজে সে কী? যে সহৃদয় আর হৃদয় ছিল বলেই বিপরীত দিকের চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার আঘাতে মৃতা—হয়তো স্বর্গের নক্ষত্র এখন। আর তার নিয়তিই এই। যার হৃদয় ও প্রেম রয়েছে তার পরিণতি এরকমই।...এই ভাষ্য আজকের কুমারীর মেনে নিতে ঘৃণা হবে। ক্রুদ্ধ হবে সে। পুরুষ যদি হৃদয়হীন হয় তাহলে আজ সে-ও তাই হবে। পুরুষ পাপী গর্দভ হলে, নারী হবে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী বহুগামী ঘোটকী, পাল্টা আঘাত করবে সে। তার শরীরের কাছে সত্তার কাছে আর মানসিকতার 'হৃদয়', 'ভালবাসা' ও 'নিয়তি' শব্দগুলোর কোনো তাৎপর্য নেই। অর্থ নেই। তাই তার প্রলাপ এরকম অনুতাপে করা হবে না, জানি। তার প্রলাপ হবে কান্নাহীন, রূঢ় ও নির্মম।

এই সত্যকে আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজ চারপাশে যে প্রতিবাদী, বিদ্রোহী ও ক্রোধী লেখালেখি, তার অন্তত দু-চারটির মধ্যে ঝলসে উঠছে না কোনো সৌন্দর্য। জীবনের কদর্যতার মধ্যে যে সৌন্দর্য তাকে তো আবিষ্কার করতেই হবে, কুৎসিতের অভ্যন্তরের...সৌন্দর্যই তো এই অন্ধকারে পথ চিনিয়ে দেবে আমাদের। যারা উপযোগী

কবিতা বা অ-কবিতা লিখছে; ভাবছে, এতে মানুষের দারুণ উপকার হবে, বিশেষ করে নির্যাতিত মানুষের। কোনো দিন কোনো কালে তা হয়নি। আজও হবে না। হয়তো এ করে তাদের অর্থ প্রতিষ্ঠা—পুরস্কার হবে। কিন্তু মূল মানবসত্তা যে সত্য স্পর্শ করতে চায়, যার জন্য এতদিন পরও র‍্যাঁবোর সৃষ্টিতে আরেকবার জেগে ওঠা, বেঁচে ওঠা এবং দূরগামী স্রোতোধারায় আরেকবার অবগাহন করে ওঠা যায়, সেই সত্য ও সৌন্দর্যের যে অনুভূতি, তার দিকে মানুষ ফিরে ফিরে তাকাবেই। কী সেই সত্য?

ছয়

না-কবিতা, প্রতি-কবিতা ও অ-কবিতা...সব কিছুই শেষ পর্যন্ত কবিতাই। কবিতার বিস্তার ও প্রসারতা এতটা দ্রুত শেষ হবার নয়; এবং কোনোদিন যে শেষ হবে, তা তো মনে হচ্ছে না। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা, নন্দনতত্ত্বের পণ্ডিতরা কবিতার যে সব সংজ্ঞা, আকার ও আকৃতি বেঁধে দিয়েছিলেন, তা কবেই ধুয়ে মুছে গেছে। গোটা নন্দনতত্ত্বই পাল্টে গেছে। আজও কেউ কেউ তথাকথিত আধুনিক কবিও ছন্দ ও ব্যাকরণের কথা মাথায় রেখে কবিতা লেখেন, এমন সময় আসছে (বা এসেও গেছে অনেকটা) যখন কবি জানতেই পারবে না বা চাইবে না পৃথিবীতে কোনোদিন ছন্দ, অলংকারের অস্তিত্ব ছিল। কবিতা কোনোদিনই নন্দনতাত্ত্বিক বা বৈয়াকরণদের ছিল না। কবিতা ছিল কবির। কবিতা এখনও কবির কাছেই নতুন শরীর ও প্রাণ চায়।

এবং একজন কবি যদি নিজেই ভাবে, সে প্রতি-কবিতা বা অ-কবিতা লিখছে, সে যদি নিজেই ভাবে, সে বিদ্রোহী, বিদ্রোহী আর প্রথা বিরোধী, প্রতিবাদী আর বিপ্লবী, তাহলে আমাদের সন্দেহ হয়। দু-ধরনের লোক প্রথমেই কপালে লেবেল এঁটে নেয়। এক, অক্ষম যারা আর যারা ভণ্ড, যাদের কিছু মতলব রয়েছে। বস্তুত, কবি লেখে। সে নিজেকে লিখতে বাধ্য হয় ভেতরের আত্মতাড়নায়। পুরনো মাপজোকের তার কথা ধরবে না বলে সে সেটা ভাঙে আর নিজের পছন্দমতন মাপমতন সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেয়।

এই সামান্য আলোচনার শেষে এসে পাঠককে জানিয়ে দিতে চাই, এই লেখা র‍্যাঁবোর সৃষ্টির নতুন কোনো মূল্যায়ন নয়, তাঁর দুর্ধর্ষ জীবনের ও সৃষ্টির পরিক্রমা নয়, নয় না-জানা কোনো তথ্যের বিস্তার। আমি শুধু আজকের আমাদের ভাষায় এবং বিশ্বের উন্নত অনুন্নত দেশগুলোর আরও অনেক ভাষায় যে বিদ্রোহী বা প্রথা-বিরোধী, প্রতি-কবিতা বা অ-কবিতার এক কলরোল উত্থিত হয়েছে, শিল্প থেকে, কবিতা থেকে মুক্ত হয়ে তথাকথিত মুখের ভাষায় সাধারণ মানুষের যাওয়ার জন্য, এক ধরনের অর্বাচীন অথচ জনপ্রিয় সৃষ্টিতে ভরে উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো ও তাঁর সৃষ্টিধারাকে দেখতে চেয়েছি। দেখতে চেয়েছি আজকের নারীবাদের পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

সত্যিকারের বিদ্রোহী রচনা, তার সময়ে বিদ্রোহী হয়েও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিদ্রোহী থেকে যায়। যদি তা অনাসৃষ্টি না হয়ে শিল্প হয়, হয় জীবনের অনালোকিত দিকের উন্মোচন ও উচ্চারণ। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো ও জীবনানন্দ সমকালেই শুধু বিপথিক নন, ধ্বংসকামী সভ্যতার বিপরীত দিকেই তাদের অভিযাত্রা।

আজকের কবি আপন অস্তিত্বের ভার আর বইতে চায় না, অস্তিত্ব থেকে ছুটি নিয়ে চিন্তা, হওয়া, ঝুঁকি নেওয়া সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে সে চলে যেতে চায় সভ্যতা উৎপাদিত সর্বশেষ বিশৃঙ্খলার দিকে। তার একটা অংশ উপভোগী ও উপযোগী এক দর্শনে আস্থা রেখে করতে চায় তাৎক্ষণিক কিছু। এর সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নিজের বিস্তার ছড়িয়ে দেবার জন্য একই সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সমর্থক, কেরিয়ারিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ সমর্থক প্রতিবাদীদেরও প্রসব করে চলেছে। কবি কি এই চক্র ভেদ করতে পারবে না?

র‍্যাঁবোর কাছ থেকে শিক্ষণীয় এই যে, কোনোভাবেই শিকড়ের অস্তিত্বকে এড়িয়ে সৃষ্টি নয়। কোনোভাবেই শিকার হওয়া নয়, শিকারীও হওয়া নয়, উন্মত্ত প্রতিযোগিতা কবির জন্য নয়। যথার্থ অর্থেই তাকে বিদ্রোহ করতে হবে, আর সেই বিদ্রোহের শেষে থাকবে নতুন এক জগৎ। নতুন এক সময়ের দিকে যাওয়া।

"ভক্তি-সংগীত আর নয় : একবার যখন চলেছো, গতিটি ছেড়ো না। কঠিন রাত শুকিয়ে-ওঠা রক্তমুখখানা আমার ধূমায়িত ক'রে দেয়। পেছনে তো কিছুই দেখছি না এক ওই বীভৎস চারাগাছটি ছাড়া। মানুষে-মানুষে লড়াইয়ের মতোই আধ্যাত্মিক লড়াইটাও সমানই পাশবিক—একমাত্র ঈশ্বরই পান ন্যায়ের পথে আনন্দ।

তবু আর একটি দিন মাত্র। আসল তেজ ও স্নেহের ফল্গুকে গ্রহণ করো মনে। ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌঁছবো আশ্চর্য নগরীতে।" [অনু : লোকনাথ ভট্টাচার্য]

১৯৮৬

র‍্যাঁবো ও রামকৃষ্ণ

......

সুবল সাহার চাটের দোকানে র‍্যাঁবো ও রামকৃষ্ণ

আমি এক উদ্ভটের মধ্যে বসে এই লেখা লিখছি। আমি বেঁচে আছি এক কুৎসিত সময়ে, কুৎসিতের ভিড়ের একজন আমি। এখানে সবাই চায় মুখ ভেংচিয়ে যেতে, এরা ভাবে অনন্তকাল ধরে মুখ ভেংচিয়ে যাওয়া যাবে। এই শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। পোকারা ছুটে চলেছে আগুনের দিকে। সারা পৃথিবী জুড়েই ছোট মানুষদের ভিড়। আহ, কী শান্তি! থুতু ছেটাও, মুখ ভেংচাও, আর ক্রীতদাসের বাজারে সবচেয়ে আগে গিয়ে হাজির করো নিজেকে, উদ্ভট, বিশৃঙ্খল ও অসাড়। কিন্তু হতাশ নই আমি। মৃতের স্তূপের তলা থেকে নিজেকে বের করে আনি এক মধ্যরাত্রিতে। লাফিয়ে পার হয়ে আসি হাড়গোড়ের পাহাড়, আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিই ও চিৎকার করে উঠি। আমার চিৎকার কেউ শোনে না। তবু আমি চিৎকার করি। আমি গান গাই, আমার বেঁচে থাকার আনন্দে। আমি নেচে উঠি এক মৃতের স্তূপের ওপর। এই কুৎসিতের আমি আর কেউ নই, আমাকে আর থুতুচাটা প্যানপ্যানানি স্পর্শ করবে না। কোনো অক্ষমতা নেই আমার, কোনো অসাড়তা, হতাশা, নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও চাতুর্য। এই ভিড়ের আমি কেউ নই।

পাতার পর পাতা আমি লিখেছি এই লেখা, লিখেছি আর ছিঁড়ে ফেলেছি। কয়েক পাতা লেখার পর হয়তো কেউ এসেছে, তাকে শোনাতে গিয়েই সারা শরীর আমার শিউরে উঠেছে, এ কী লিখছি আমি! টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিয়েছি। আর অবশেষে চলে যাই সুবলের দোকানে। যেখানে গিয়ে আমি স্বস্তি পাই। না ঠিক স্বস্তি নয়, মুক্তির স্বাদ পাই। সুবলের ঘুপচি দোকানে বসে মনে হয় আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি। সবার মুখের দিকে তাকাতে পারি। সারা দুপুর সেখানে বসেই র‍্যাঁবো আর রামকৃষ্ণ নিয়ে মেতে থাকি। বেশ্যারা এসে আমাকে খোঁচাতে শুরু করে, আমি পাত্তা দিই না। মদ ছলকে কাগজপত্রের ওপর পড়ে, বাঁ হাতের চেটোয় মুছে ফেলি। আমি যে ঠিক লিখি তা নয়, আসলে ধীর ও মন্থর পায়ে হাঁটি শার্লভিল শহরের চাপা ও মধ্যযুগীয় গলি ধরে। শরীর কাঁপতে থাকে আমার। মনে হয় এই বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাব সেই জ্বলন্ত চোখ, আগুনের শিখা যার সারা মাথা জুড়ে, হয়তো কোনো পুরনো ধুলোময়লা ভর্তি বইয়ের দোকানে। আমি ঘুরে বেড়াই কামারপুকুরের পথে পথে। দিব্যজ্যোতি দর্শনের পর সংজ্ঞাহীন বালক। যাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হচ্ছে বাড়িতে.....

সন্ধ্যাবেলার দিকে আসে বয়স্ক রামকমল সেন, এসেই আমাকে জিগ্যেস করে, 'কী হচ্ছে'?

আমি বইপত্রগুলো তার দিকে ঠেলে দিই। সে ঝুঁকে পড়ে দেখে। কপালে ভাঁজ পড়ে, সে তার সাদা দাড়িতে হাত রাখে, পরক্ষণেই হাঃ হাঃ হাসিতে ফেটে পড়ে, 'বেশ্যা বাড়িতে বসে রামকৃষ্ণ হাঃ হাঃ'!

'হ্যাঁ, তাই' আমি তার হাসি ছাপিয়ে চিৎকার করি।

'অ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিকই আছে' সে মাথা নাড়তে থাকে, 'তাছাড়া, আর কোথায় বসে লিখবা, ঠিক আছে..., ঠিক আছে...।'

কেন আপনার বাড়িতে বসে, আপনার তো অনেক ঘর, একটা দিয়ে দিন আমাকে—কিছুদিনের জন্য।

'আমার বাড়ি' রামকমল ফেটে পড়ে, 'বাড়ি নয় নরক, ওর চেয়ে এই জায়গা শতগুণে ভালো...আমার বাড়ির মাগিদের তো তুমি জানো, য্যান্ কত সতী, কিন্তু আসলে—

আমি তাকে থামিয়ে দিই, 'এখানে বসে লিখছি না আমি, লেখাটা এখান থেকেই শুরু করতে চাই...'

'হ্যাঁ, এখান থেকেই শুরু করা যায়...এখান থেকেই'..., মাথা নাড়তে নাড়তে সে বোতল ও গ্লাস টেবিলের ওপর রাখে, বসে পড়ে মুখোমুখি।

'ক্যালেন্ডারের ছবিটা দেখেছেন', সুবল আঙুল তুলে দেখায়, আমরা দেখি রামকৃষ্ণ, সারদামণি ও কালী, না মূর্তি নয়, জীবন্ত ও লীলাময়ী। সারদামণি পেছনে, কালী সামনে-তার হাতে একটা বাছুরের দড়ি। মাঝখানে সেই গোবৎস। এ কোন, বাছুর? হৃদয়ের সেই বাছুরটি কি? সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত রামকৃষ্ণকে দেখি। আহা, ছোট মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা।

'আচ্ছা দাদা, সারদামায়ের মুখে হাসি নাই কেন্'? কোণের দিকে একা বসে দুপুর থেকে মাল্ টেনে যাচ্ছে, প্রশ্নটা সেই ছুঁড়ে দেয়। ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, আমরা চুপ। পরে সে আরও জানতে চায়, 'কিন্তু ঠাকুরের তো রঙ্গ তামাসার কূলকিনারা নাই...তাই না? ...আমি একটা মূর্খ, মাতাল...ঠিক বললাম কি?'

রামকমল বিরক্ত, 'অরুণেশ, এখানে হবে না, চল্ মুক্তির ঘরে।'

'হইচে, মুক্তির ঘরে যাইয়া আর এইসব হবে না তখন মুক্তিরে নিয়া...' সুবল একটা নাচের ভঙ্গি করে।

আমরা হেসে উঠি। আমাদের হাসির শব্দ পেয়ে দুজন বেশ্যা রাস্তার ওপাশ থেকে ছুটে আসে। একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামে ঠিক ভাটিখানার দরজায়, বেশ্যা আর মাতালেরা আড়চোখে তাকায় সেদিকে। রামকমল তার প্যাকেট থেকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, 'র‍্যাঁবো কিন্তু আমার সম্পূর্ণ জানা হল না.. তুই জানিস্?'

'জানি'

'কোন্ কোন্ বই পড়েছিস র‍্যাঁবোর'?

'নরকে এক ঋতু...'

'সে তো আমিও পড়েছি, তোর কাছ থেকে নিয়েই পড়লাম...কিন্তু আর কী পড়েছিস, র‍্যাঁবোর ওপর তো অনেক লেখা হয়েছে...'

'আমাকে আর পড়তে হয়নি... আমি জেনে গেছি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি আমি'।

'প্রত্যক্ষ করেছিস' চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকায় সে।

'হ্যাঁ, সেই ১৯ বছর বয়সে, যখন আমার হাতে প্রথম 'নরকে এক ঋতু' আসে।'

সাঙ্ঘারবাড়ি ভাটিখানায় এক দুপুরবেলা—

...ধু ধু মাঠের মাঝখানে এক কালো ভাটিখানা। পিচের ড্রাম কেটে তৈরি করা ঘর, পিচের ড্রামের বেড়া। ঘর, ঘেরা ও সদর দরজা সব কালো। জালঘেরা জানালা। জানালার নীচে ফুটো। যে ফুটো দিয়ে একটা হাত একটা বোতলই বের করে আনতে পারে। একটা, দুটো নয়। জালের ওপারে বুড়ো কর্মচারী। সেই ঘরের দরজা ঠিক কোন দিক দিয়ে আমরা জানতাম না। আমি একা এক দুপুরবেলা বসেছিলাম। ভাঙাচোরা বেঞ্চে, কাত হয়ে, পড়ে থাকা একটা তিন পায়ার টেবিল আর খোলা দরজা দিয়ে ছুটে আসছিল চৈত্রের বাতাস খড়কুটো, পাতা, নোংরা কাগজ ও ধুলো। মদ তখনও নিইনি। সম্পূর্ণ নেশাহীন আমি। সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ও উন্মুক্ত আমি। কাঁধের ঝোলায় 'নরকে এক ঋতু'... আহ, আমার বয়সও তখন ১৯,যখন 'নরকে এক ঋতু'...আমার হাতে এসে গেছে। সেই বই নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই গ্রামের মেলায়, জুয়ার আসরে, আদিবাসী গ্রামে, শহরের বস্তিতে আর বেশ্যাপল্লিতে। আমি আমার অশিক্ষিত বন্ধুকে পড়ে শোনাই। জুয়াড়িকে, মাতালকে আর দালালকে পড়ে শোনাই। এমনকী বেশ্যাকেও আমি পড়ে শুনিয়েছি র‍্যাঁবো। কিন্তু সেই দুপুরবেলা ছিলাম উন্মাদপ্রায়। আমিও এই পরিচিত পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কী করব। কোথায় যাব—জানতাম না। নিজের কথা আমার মনে আসছিল না। ঠিক তখনই সে ঢোকে। দুই চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে, জ্বলন্ত দুই চোখ। মাথার চুল নয়, আগুনের শিখা। চাপা ঠোঁট, ছেঁড়া ময়লা পোশাক। হাঁটার ভঙ্গিতে সিগারেট টানার তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে কী দাম্ভিকতা...কিন্তু সে নিঃস্ব, শূন্য ও চলমান। আমার দিকে একবারও তাকায় না। সোজা হেঁটে গিয়ে ভাটিঘরের জানালার কাছে দাঁড়ায়। ফুটো দিয়ে দু-টাকার একটা লালচে নোট এগিয়ে দেয়। একটা বোতল সমেত হাতটা বেরিয়ে আসে। ঘুরে দাঁড়ায় সে। একবার আমাকে সে কি দেখে? নাকি আমার ভেতর দিয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় আরও দূরে—দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত! সোজা সে বেরিয়ে যায়, পেছন ফিরে তাকায় না এক মুহূর্তের জন্যও। হয়তো সে কোনো সাইকেল সারাই দোকানের ছোক্‌রা কর্মচারী। তার আসল পরিচয় আমার চোখ থেকে মুছে যায়। আমি র‍্যাঁবোকেই প্রত্যক্ষ করি। সাঙ্ঘারবাড়ি ভাটিখানায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমার বয়সও ১৯। ইউরোপ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে শেষ করে...।

অরুণেশ, তোর ভয় করে না?

রামকমলের সামনে উপচে পড়া গেলাস, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। সে মাল টানছে না, সিগারেটও বাতাসে জ্বলে যাচ্ছে। ফর ফর করে পুড়ে যাচ্ছে। সে শুধু হাঁ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘ একটা সময় পর সে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাস। খুক্ করে কাশে: 'অরুণেশ তোর ভয় করে না?' সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'না ভয় ভেঙে গেছে...লজ্জাও আমার নেই'

এরা কেউ ছোট মানুষ নয়। এই বেশ্যা, মাতাল, খুনি, চোর, পকেটমার, ডাকাত, জারজ, পাগল, ভিখারি ও অন্ধ বেহালাবাদক। আমার চারপাশেই এরা, আমার ভেতরে আমার বাইরে। আমার থেকেও বড় এরা। এরা বড় না ছোট—ভাবে না। প্রতি মুহূর্তেই সক্রিয়। অন্ধকারের একেকটি কণা। অন্ধকারে মিশে যাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোনো ভয় নেই পাগলের, উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভয় নেই বেশ্যা ও মাতালের তারা জানে তাদের ভবিষ্যৎ। খুনি নিচু স্বরে কথা বলে। দালাল এসে বলে, পুলিশ যা করার করুক, আমি ঠিক আছি। পকেটমার ছেলেটি জানায়, 'বড়বাবু আমার দাঁত ভেঙে দিয়েছে—এই দেখুন, হাঃ হাঃ উন্মত্ত পৃথিবী।' 'মরণের বন্ধু গোষ্ঠী'দের এক অবিরাম নৃত্য। আমিও তাদের সঙ্গী। যে ভয় ছিল আমার, তা ঝরে গেছে। আমরা ভয় পাই মৃতদের। প্রেতাত্মাকে। মৃতরা চিরদিন ভয় দেখিয়ে এসেছে একইরকম ভাবে। আজ শবের ওপর জীবিতদের উৎসব।

ভয় সময়কে। ওহো, আমাকে বুঝি আধুনিক পৃথিবীর একজন বলে কেউ মেনে নিল না! আমি হতে চাই আধুনিক। কবি, শিল্পী, ইন্টেলেক্চুয়াল আর রাজনৈতিক ক্রীতদাস! আমি আমার স্বপ্নগুলিকে মনে করি অসম্ভব ও মিথ্যা। এই সময়ের সঙ্গে মেলে না! গোপন করি আর ভুলে যাই। ভয়ে মুখ খুলি না। আমি আমার কল্পনাকে ধারণ করি, মেনে নিই শ্লোগান, চিৎকার ও পচা ইস্তেহার। আমি চিৎকার করতে ভয় পাই। গান গাইতে ভয় পাই নাচতে ভয় পাই। কাঁদতে ভয় পাই। বিদ্রূপ করি সত্য আর সৃষ্টিকে। আমি আধুনিক হতে চাই, যেমন এই সময়ের ক্ষুদে মানুষেরা আধুনিক। যেমন জন্মান্ধরা আধুনিক। ভবিষ্যৎকে আমি দেখে নিয়েছি প্রথম দৃষ্টিপাতেই, কিন্তু তা বলার সাহস নাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুঁড়ে দেবে আমাকে।

এই ভয় ছিল না র‍্যাঁবোর, এই ভয় ছিল না রামকৃষ্ণেরও। গত শতাব্দীর সব যুক্তিবাদী আর নবজাগরণের যোদ্ধারা তাঁর পায়ের তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই সময়ের বুকে আজ আর কোনো ছাপ নাই তাঁদের। র‍্যাঁবো এক মুহূর্তে অতিক্রম করে গিয়েছেন সব পদ্য পাগলাদের, সব শব্দমুগ্ধ তথাকথিত 'আধুনিক জীবনের রূপকারদের...'।

ভিতু কবির দল আশ্রয় খোঁজে বড় কবির মধ্যে। ভিতু অবিশ্বাসীর দল আশ্রয় খোঁজে বড় মানুষের মধ্যে। তারা পোকার মতোই একের পর এক শবদেহ খোঁজে। উন্মত্ত পোকার

দল, শুধু কাতর প্রার্থনা, আমাদের রক্ষা করো। হঠাৎ দু-একজন চোখ মেলে তাকায়। মাথা তার স্পর্শ করে নক্ষত্রলোক। সে ছাড়িয়ে যায় পোকাদের। যে দেখে কোথাও আশ্রয় নাই। সে টের পায়, তার একমাত্র আশ্রয় সে নিজেই। বহমান সেই ঢেউকে সে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে। সবকিছুই ছুঁড়ে ফেলে সে। নিজেকে নগ্ন করে। সে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যায়...

'যদি র‍্যাঁবো আর রামকৃষ্ণ না জন্মাত পৃথিবীতে তাহলে কার কাছ থেকে এতটা সাহস...'?

'কেন, এই নীলুর কাছ থেকে' আমি সামনে বসে থাকা এক বেশ্যাবালিকার কাঁধে হাত রাখি, সে হকচকিয়ে উঠেই হো হো করে হেসে ওঠে।

'যদি এরাও না থাকত?'

'তখন....তখন নিজের কাছ থেকেই...'

রামকমল স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার একপাশে অপরাধ জগৎ, অন্যপাশে ঐশী উন্মাদনা। দুই-ই উন্মাদ জগৎ। আমি একটিমাত্র সত্তা, যোনিভেদী লিঙ্গ। যে পথে পা বাড়াব, সেই পথই সেখানে গিয়ে মিশেছে। অসীমে। কিন্তু পথগুলিই কী রোমাঞ্চকর! আসলে পৃথিবী একটাই। তরঙ্গমালার বিস্তার শেষহীন। আলো ও অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

১৯৭৭

শূন্যগর্ভ ভাষা ও কবিতার অপমৃত্যু

......

কেউ কেউ বলছে, ভাষা দিয়ে আর কিছু করা যাবে না। দেশে ও বিদেশে এ কথাটা যারা বলে তাদের দৃষ্টি সাধারণত থাকে চলচ্চিত্রের দিকে, এরা বিজ্ঞান, যন্ত্রসভ্যতা ও মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির অজুহাত দেখিয়ে ভাষাকে হেয় করে, তীব্র গতির যুগে ভাষা তাঁদের কাছে বলদ টানা গাড়ির মতো।—তারা ভাষা নিয়ে চলতে পারছে না। হ্যাঁ, চলচ্চিত্রই এখন সবচেয়ে সহজ মাধ্যম যার মধ্যে পালিয়ে বাঁচা যায়, যাতে ভণ্ডামিটা বেশ ধীরেসুস্থে, আয়েশ করে করা যায়, লোকে চট্ করে ধরতে পারে না। অনাহারে একজনের মৃত্যু হচ্ছে—এ নিয়ে কবিতা লিখলে একটি গল্প বা উপন্যাস লিখলে ততটা কায়দা করা যায় না, যা করা যায় একখানা ফিল্ম করলে। যারা ওই অনাহার মৃত্যুর কারণ তারাই তাকে—পরিচালককে পুরস্কার দেয়, যে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তার এই তথাকথিত 'প্রতিবাদ' তারাই একটি ফিল্ম করবার জন্য আগ বাড়িয়ে এসে টাকা দেয়, একটি অনাহারে মৃত্যুর ছবি করতে প্রয়োজন হয় এক লক্ষ টাকার—হাঃ হাঃ। খুব সহজেই সে চোখে পড়ে যায়, প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রগুলি তার ছবি ছাপে, সাক্ষাৎকার নেয়, তাকে বিদেশ পাঠায়, 'বিপ্লবী' বলে শোষকশ্রেণীর বাড়তি আদরটুকু সে-ই পায়। মোটামুটি এই হল শোষণের নতুনতর পদ্ধতি, এখনকার দালালদের গায়ে লাল জামা থাকতে হবে, সে যত ইচ্ছে মিছিল মিটিং মারদাঙ্গা দারিদ্র অনাহার যা খুশি নিয়ে ছবি করতে পারে কিন্তু কখনোই যেন সেখানে এসে জুড়ে না বসে তারই জীবন ও স্বপ্ন, কল্পনা ও সত্য অভিজ্ঞতা। একমাত্র ঋত্বিক ঘটকই এর ব্যতিক্রম। তিনি মাধ্যমটিকে সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারা ওই কথা বলে এ কারণেই যে সত্যি তারা ভাষা দিয়ে কিছুই করতে পারছে না, ফুরিয়ে গেছে, ভাষার জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করতে হলে যে 'ভয়ংকর কাজটি' আজ একজন কবি ও লেখককে করতে হবে, তা করবার ক্ষমতা তাদের নেই। ভাষার সংকটের কথা, তার সীমাবদ্ধতার কথা আমরা এতবার শুনেছি যে—এ সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক, না, শেষ পর্যন্ত দোষটা ভাষার নয়, দোষ সেই উৎসের, ভাষা যেখান থেকে জন্ম নেয়। উৎস শুকিয়ে যায়, সে আর স্বপ্ন দ্যাখে না, কল্পনা করবার শক্তি আর তার থাকে না, চিন্তা ভাবনা একটা জায়গায় এসে থেমে যায়, সে পারেও না নিজের মধ্যে নিজের মৃত্যু পুনর্জন্ম ঘটাতে, লেখাকে সে তো ধরে নিয়েছে শুধুমাত্র একটি সামাজিক ক্রিয়া হিসেবে। সত্যকে সে দেখেও দ্যাখে না...সব দোষ ভাষার!

রবীন্দ্রনাথের যে ভাষা, সে ভাষাকে মনে করা হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের 'মুক্তিদাত্রী'

হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থাতেই সেই ভাষার অপমৃত্যু তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে, শেষ বয়সে তাঁকে অনুকরণ করতে হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা—এটা অনেকটা রাজামশায়ের দারোয়ানেরা ভাবে ও ভঙ্গিতে কথা বলার মতন। আর অবশেষে আশ্রয় নিতে হয়েছে নাচে ও গানে, যেখানে ভাষার প্রশ্নটা জরুরি নয়, সেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলেন মনে হয়। তবুও সেই মৃত ভাষার মধ্যেই দলে দলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে ক্ষুদে ক্ষুদে পোকারা, যারা কেউ কবি কেউ লেখক কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী বা সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। মূলত এই, এটাই ছিল তথাকথিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

জীবনানন্দ সম্পূর্ণই নতুন এক ভাষার সৃষ্টি করেন, না, শুধু এর আকার ও অবয়বই নতুন নয়, এই সেই ভাষা যা জীবনের, নৈরাজ্যের, বিশৃঙ্খলার ও ভালোবাসার, বিশাল পর্বতের চূড়ার সামান্য অংশই যেন জলের ওপরে দেখা গেল। আর তাঁর এই অবৈধ সন্তানটিকে নিয়ে নিজেরই আতঙ্ক ও আশঙ্কা ছিল সব থেকে বেশি কারণ জীবনানন্দের ভাষা কেউ মেনে নিতে পারেনি, তাঁকে ধরে নেওয়া হয়েছিল নেহাতই একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে, যারা তাঁর প্রশংসা করেছিল, যেমন বুদ্ধদেব বসু, তিনি এই ভাষাকে ঠিক বুঝে উঠতেই পারেননি। জীবনানন্দের স্ত্রী নাকি শেষদিকে বুদ্ধদেব বসুদের বলতেন, 'আপনাদের তো কিছু হল, ওর তো কিছুই হল না...' হায়...আজ ১৯৮১...কোথায় সেইসব বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে থেকে সুভাষ মুখার্জির দল, গোটা প্রেক্ষাপট জুড়ে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ—তাঁর এই ভাষার জন্যই নয় কি? তবুও বলা যায় তিনি, জীবনানন্দ তাঁর ভাষাকে নিয়ে স্বস্তিতে ছিলেন না, তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি, নিজের হাতেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন তার বিকাশ। ভাষার চেয়ে শিল্প, জীবনের চেয়ে আদর্শ, নৈরাজ্যের চেয়ে ঐতিহ্য, অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলার থেকে আলো ও উল্কার আকাঙ্ক্ষা তাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল আর ভাবিয়ে তোলার কারণও ছিল, যদি অন্ধকারই তাঁর কাছে আলো হয়ে দেখা দিত, নৈরাজ্যকে সঠিক ঐতিহ্যে রূপান্তরিত করতেন, শিল্পকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে সত্যকেই প্রকাশ করতেন প্রতিটি লেখায়, তাহলে আজও হয়তো তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতই থাকতে হত। জীবনানন্দ দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন, যে দরজা দিয়ে এসে ঢুকল এমন একটা ভাষা, যা এত দ্রুত, এতটা কম সময়ের মধ্যে গোটা ভাষা-শরীর থেকে রবীন্দ্র প্রভাবকে মুছে ফেলতে পেরেছিল।

বাংলা গদ্যভাষা যে এতখানি দুর্বল, কবিতার ভাষার থেকে এক শতাব্দী পিছিয়ে, তার কারণই এই বাংলা গদ্যে কোনো জীবনানন্দ নেই। অনেক সময়েই আমরা এই সত্যটিকে এড়িয়ে যাই, এড়িয়ে গিয়ে এই সংকীর্ণ ও জড়ভাষা দিয়েই লিখে ফেলতে চাই একেকটি আধুনিক উপন্যাস আর তার যা পরিণাম ঠিক তাই হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কমল কুমার মজুমদার, কেউই বাংলা গদ্যভাষাকে সক্রিয়তা দিতে পারেননি যা জীবনানন্দ খুবই স্বাভাবিকভাবেই দিয়েছিলেন কবিতার ভাষাকে। বাংলা ভাষায় একজন কবি ও গদ্য লেখকের

মূল পার্থক্য এখানেই : একজনের কাছে নৈরাজ্যের চেহারা স্পষ্ট, অন্যজন এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে সারিবদ্ধ বস্তুজগতের মধ্যে, একজন ধ্বংস করতে পেরেছে তার ভেতরের সমস্ত মূল্যবোধ, অন্যজন পুরনো মূল্যবোধগুলোকে সম্পূর্ণ বর্জন করার আগেই গ্রহণ করে বসে আছে নতুন কিছু মূল্যবোধ, যা আসলে পুরনোরই রকমফের, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও যন্ত্রসভ্যতা সৃষ্ট বিকারগুলো প্রথমজন বুঝে নিতে পারে সহজেই আর দ্বিতীয়জন সেখানে সেই বিকার ও বিকৃত উল্লাসের কখনও বা অচেতন শিকার মাত্র, কখনও দেখেও চোখ বুজে থাকার ভান করে।

'কেন লিখি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশী...আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।' অথচ 'অনেকের চেয়ে বেশী' কী সেই অভিজ্ঞতা, যা আর আমাদের জানা হল না, আড়াই বছর বয়স থেকে তাঁর সেই 'দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিহাস' বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে অজানা রইল। না, 'শিল্প' নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা যে বাজে, তিনি বুঝেছিলেন, এতসব সত্ত্বেও জীবনের যা সত্য, সেই সত্য রয়ে গেল অনুন্মোচিত। পুতুল নাচের ইতিকথা কিংবা পদ্মানদীর মাঝি অথবা অহিংসা তুলনামূলকভাবে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাজ, সে সব বইতেও লেখক নিজে উপস্থিত নেই, কোথা থেকে শুরু করতে হবে নিজের কথা, কী-ই বা তাঁর জীবন,সত্যি বাংলা গদ্য লেখকদের কাছে এটা একটা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা, যা অনেক আগেই খুবই স্বাভাবিক ছিল দস্তয়েভস্কির কাছে। ভাষার আরও এক অনড় প্রাচীর গড়ে তুললেন কমলকুমার মজুমদার, যা কোনো দিক দিয়েই আজকের কোনো সৃষ্টিশীল আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই ব্যর্থতাগুলোর ইতিহাস থেকেই একজন তরুণ লেখককে অভিজ্ঞতা নিতে হবে, তা না হলে সে-ও ওই একই রকম ফাঁদে পড়ে ছটফট করবে, যা বাইরের ব্যাপার যেমন ভাষার কারুকাজ বা সৌন্দর্য, নয়তো কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক মতবাদের চেয়ে তার নিজের জীবন উপলব্ধিকে মনে হবে তুচ্ছ।

বাংলা গদ্যভাষা যে শরৎচন্দ্রের পরিমণ্ডল অতিক্রম করতে পারেনি, এই সত্য আজ আর কোনো ভঙ্গি ও ভণ্ডামি দিয়েই ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষার কৃত্রিমতা ও জড়তা, কুৎসিত ও ধর্ষিতরূপও পাঠকের কাছে অস্পষ্ট নয়। ভাষার এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ইতিহাস অজানা নয় কারুর, এই সস্তা অক্ষম ও বীর্যহীন ভাষা কখন কীভাবে গড়ে উঠল, কীভাবে আবর্জনা ঢুকে রুদ্ধ করে দিল স্রোত—সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করার মতন ক্ষমতা ও সাহস আর বুদ্ধি কারুরই নেই। দূর মফস্সলের অখ্যাত পদ্যকার বা লেখক থেকে শুরু করে শহরের সফল বা ব্যর্থ, প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত সবাই মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এরই মধ্যে, এই মজে যাওয়া ভাষার বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদ করতে পারে না, এই নষ্টামির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ক্ষমতা এদের নেই। যে বিরোধিতা করবে তাকেই এই মিথ্যা ও ভাঁড়ামি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে নতুন এক ভাষা সৃষ্টি

করে নিতে হবে, এটা ভাবতেই হাত পা ঠান্ডা, অসাড় হয়ে যায় ছোট ছোট পদ্য লিখিয়ে-দের, তার চেয়ে এই-ই ভালো। অমিয় চক্রবর্তী—বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ ও কৃত্তিবাসের মাঝামাঝি আরও কয়েকজন, যাদের ভাষা কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি এই সময়-শরীরে, এরা এসেছিল আধুনিকতার খোলস পরে। সেই অর্থে কোনো ভাষাই এদের ছিল না—যদি ওইসব লেখার পাশাপাশি রাখা যায় জীবনানন্দের সবচেয়ে দুর্বল একটি লেখা তাহলে সম্পূর্ণ ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়। কবিতা এদের কাছে ছিল কাঁথা সেলাই বা সূচিকর্মের মতন, সাহিত্যে কবিতার নিশ্চয় বিভিন্ন ধারা থাকবে, সত্যকে প্রকাশ করবার ও জীবনে প্রবেশ করবার একটিমাত্র পথই যে আছে তা নয়, অসংখ্য, বলা যায় প্রতিটি মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন, আগে যারা এই গ্রহে কাটিয়ে গেছে, এখন যারা কাটাচ্ছে আর পরে যারা আসবে বা তারও পরে প্রত্যেকের জন্য এককেটি...তবু এইসব কবিতা লেখকরা শুধু গালগল্পে ভরিয়ে তুললেন বাংলা সাহিত্য। এরা ভিতরে ঢুকতে সাহস পেলেন না। অথচ এদের ভূমিকা, ভনিতা ও বাংলা কবিতা জগতে প্রবেশ করবার পোজ দেখে মনে ধরেছিল, এরাই বুঝি বাংলা কবিতায় এলিয়ট, ভ্যালরি ও রিলকে। কী না ছিল এদের, পণ্ডিতি, দার্শনিকতা, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক, সামাজিক চেতনা, বিদেশি বই পড়ার অভিজ্ঞতা? হয়তো অভাব ছিল মূল ব্যাপারটারই : কেউই কবি ছিলেন না—

এই করুণ ব্যর্থতা থেকেই কৃত্তিবাসের কবিরা শিক্ষা নিয়েছিল মনে হয়, তারা তাদের অজান্তেই সামাজিক-রাজনৈতিক ভড়ং যা লোক দেখানো বিদ্রোহ, সস্তা দার্শনিকতা ও নিজেকে পতিত ভাবার মূর্খতা থেকে সরে আসতে চেষ্টা করে। বাংলা কবিতার পাঠক যদি কৃত্তিবাসের কবিদের দেখে ভুল করে থাকে, 'হয়তো এরা কিছু করবে', এরকম যদি ভেবে থাকে, সে দোষ পাঠকদের দেওয়া যায় না। সত্যি এদের ভঙ্গি ছিল চমক লাগিয়ে দেওয়ার মতন, মঞ্চে ঢোকবার আগেই পর্দার আড়াল থেকে একের পর এক ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল ধোঁয়া বোম্, ধোঁয়া যখন কেটে গেল, দেখা গেল যারা হুল্লোড় করেছিল বেশি, যারা চিৎকার চেঁচামেচি করে ডিগবাজি খেয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল, 'আমরা জীবনানন্দের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছি'—হ্যাঁ, সত্যি, তাই তারা কাটিয়ে উঠেছে, মঞ্চে এসে দাঁড়াল মাথায় হেলমেট মুখে মুখোশ সাদা পোশাকের গুটিকয়েক বামন, যারা বাংলা কবিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দিষ্ট। দুর্বল ও ভিতু মানুষ অনেক সময় এমন কিছু মুখে বলে ফেলে বা করে ফেলে তার তাৎপর্য সেই মুহূর্তে সে ঠিক বোঝে না, তবু সে একটা ঘোরের মধ্যে সেইসব করে চলে যখন তার তাৎপর্য সে বুঝতে পারে যখন সমগ্র চিত্র তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে তখন ভয়ে আতঙ্কে পেছন ফিরে ছুটে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কৃত্তিবাসী কবিদের এই পেছন ফিরে ছুটে পালানো বাংলা ভাষায় একটা বড় রকমের ঘটনা, যদিও তারা একা বা নিঃসঙ্গ পালিয়ে যেতে চায়নি, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পেরেছে একপাল দর্শক, যারা তাদের পাঠক ও ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ কবির দল। ভণ্ডামির শুরু এখান থেকেই, যে চৈতন্য থেকে জন্ম নেবে নতুন ভাষা সেই চৈতন্যের

সাথেই তাঁদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।

'আদার ব্যাপারী বানিয়েছে এক জাহাজ মার্কা বাড়ি...' এরকম একটা লাইন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গ, এই আদার ব্যাপারীর জাহাজ মার্কা বাড়ি বানানোর প্রসঙ্গটি এতটাই তাঁর প্রিয় ছিল যে, কবিতা ও গদ্যে তিনি বারকয়েক উল্লেখ করেছেন। আজ এই আদার ব্যাপারীটিকে কি স্পষ্টই চেনা যায় না? আর তাঁর বিশাল জাহাজ মার্কা বাড়ি?...'কবিতা' ও গদ্য লেখক হিসেবে আজ যারা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহকর্মী বা প্রতিদ্বন্দ্বী তারা প্রত্যেকে ওই একই বস্তুর ব্যবসায়ী, প্রত্যেকে তৈরি করে ফেলেছে ছোট ও বড় জাহাজ মার্কা বাড়ি। জীবনানন্দের প্রতি এদের একটিই নিঃশব্দ অভিযোগ : আপনি মশাই খুব বড় বড় কথা বলেছেন, বিশাল বিশাল সব ভাবনা আপনার মাথায় এসে যেত...ওই সব করে তো শেষ পর্যন্ত...আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ করার পরিণাম...

'কবিতা লেখা একটা সরল কাজ, তার জন্য কবিতা লেখার ভান করার দরকার হয় না'—এরা বলল। গড়ে তুলল এমন এক ভাষা যা প্রাণহীন ও মিথ্যা হলেও মনে হবে প্রাণবন্ত ও সত্য, যা আধুনিক না হয়েও আধুনিকতার ভান, জীবন্ত না হয়েও জীবন্ত ভাষার মতনই দেখতে, এই ক্ষমতা ছিল বলেই ভাষা দিয়ে একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সেবা ও তরুণ পদ্য লিখিয়েদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখা, দুটোই সম্ভব হয়েছে এদের পক্ষে। যার স্বাদ ও গন্ধ পেয়ে কিলবিল করে নড়ে উঠল সেইসব 'চোখ-না ফোটা ছোট মানুষের দল', যারা এতকাল জীবনকে ভয় পেয়ে এসেছে, যারা 'নৈরাজ্য' আর 'অন্ধকারে'র কথা শুনলে কপাট বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। চারপাশে গড়ে উঠল ছোট ছোট গোষ্ঠী, থুতু চাটা, ন্যাকা ও চতুর পদ্যকারের দল, তাদের কারুর উপাস্য দেবতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কারুর বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যেকেই বেছে নিতে চায় এমন একটি সুবিধেজনক স্থান, এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় যেখানে থাকলে কোনো আঁচড়ই গায়ে লাগবে না, যেখানে আশ্রয় নিলে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে আবার তরুণ কবিদের কাছে, পাঠকের কাছে এক ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ইমেজও রাখা যাবে। ভাবটা এই : আমরা শিল্পী মানুষ এইসব সাতে পাঁচে নেই ভাই!...ভাষা ওদের কাছে খেলনা, কিছু চটুল ও ঠুনকো শব্দের সমষ্টি মাত্র, যা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যাবে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও। খুঁজে পেতে এনেছে নতুন নতুন শব্দ দু-একবার ব্যবহারের পর ছুঁড়ে দিয়েছে এদেরই চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অভুক্ত সেইসব পশুদের দিকে, যারা লোলুপ দৃষ্টি মেপে তাকিয়ে আছে মুখ তুলে, যাদের এরাই লোভ দেখিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ এই দুই দানব প্রতিভার পর, কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এরকম ছোট কবিদের ভিড় খুবই স্বাভাবিক, আর তারা তাদের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে খানিকটা সচেতন ছিল মনে হয় সেজন্যই ওই ক্ষুদ্রত্বকেই একটা দৃষ্টিভঙ্গি একটা দর্শন হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। কিছুটা সত্য থাকতে পারে এর মধ্যে, প্রকৃত ঘটনা, সম্পূর্ণ সত্য তা

নয়। আসলে এরা চেয়েছে নগদ বিদায়, আধুনিক কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে সরাসরি ব্যবসা, এদের গদ্য লেখাগুলির ভাঁজ খুললে, দেখা যাবে ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে জীবনানন্দেরই কবিতা। অবশ্য এই একটা কী দুটো সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেলেই সৎ লেখালেখির পথ পরিত্যক্ত হয় না, তবে দেরি হয়ে যায়, যারা সেই পথে যাবে তাদের আরও বেশি উপহাস ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়, হয়তো কেউ সহ্য করতে না পেরে ছিটকে বেরিয়ে যায়, কারুর মৃত্যুও হয়।

ভাষা শুধুমাত্র শব্দ সমষ্টিই নয় ভাষা ভ্যান্‌গগের কাছে তার রং ও তুলি , আর্তোর কাছে শব্দ, বাক্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টি; হয়তো কারুর কাছে কোনোদিন ক্যামেরা ও ফিল্মও জীবন্ত ভাষা হয়ে উঠবে। মাধ্যমকেই ভাষা বলতে হয়, যার মধ্যে নিজেকে একজন প্রকাশ করে, কী সে জন্ম দেয়, সেটাই দেখার। ভাষা সক্রিয় হয়ে ওঠে, যখন সে চিন্তায় ও চেতনায় সক্রিয় হয় তখন। সেই কারণেই কবিতা লেখা এখন আর সরল কাজ নয়, কবিতা লিখতে কবিত্বের ভান করতে হয় না ঠিকই কিন্তু তাকে নিজের কাছ থেকেই জেনে নিতে হয় এই ক্রীতদাসত্ব থেকে সে মুক্তি চায় কিনা?

যদি সে তাই চায়, কবিতা লেখা তার কাছে সরল তো নয়ই এমনকী শুধুমাত্র জটিল বা কঠিনই নয়, কবিতা লেখা হয়ে উঠবে একটা ভয়ংকর কাজ। সভ্যতার গতি একসময় ছিল ধীর ও মন্থর, জাহাজের মধ্যবর্তী যাত্রীর মতনই মানুষ বুঝতে পারেনি তার প্রকৃত অবস্থান ও অবস্থা আজ তীব্রবেগে ছুটে চলেছে সভ্যতা, একা একজন কবি কী করতে পারে এই বিকট কর্মকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে—এরকম ভাবতে পারে সে। কবিকে ধ্বংস করবার অস্ত্র যেমন তার শত্রুর হাতে রয়েছে, সেরকম কবির কাছেও রয়েছে তার শত্রুকে ধ্বংস করবার অস্ত্র, সে অস্ত্র তাঁর মধ্যেই, যে অস্ত্র তাঁর চিন্তায় চেতনায় ও ভাষায়, সে অস্ত্র সে নিজেই। মিথ্যার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের উলঙ্গ ও সত্য রূপকে খুলে মেলে ধরতে হবে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে নপুংসকদের ভিড় থেকে।

১৯৮১

অপরিচিত অথচ সৃষ্টিশীল

......

আমি আমার শৈশবের অরণ্যঘনিষ্ঠ গ্রামগুলোতে এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছি, যারা শুধু বেঁচে থাকতেই জানত না, অন্যের বাঁচার প্রেরণাও হয়ে থাকত, হয়তো বা মৃত্যুর পরেও। এঁরা প্রায়শই হতেন শিল্পী এবং দলছুট আর সমাজছুট। সমাজবদ্ধ মানুষদের সঙ্গে এঁদের অদ্ভুত একটা ঘৃণা-ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। লোকজন এঁদের ঘৃণা করত, এঁরা প্রকাশ্যে কেউ জুয়াড়ি কেউ বা বহু নারীতে আসক্ত অথবা কেউ সমকামী বলে কিন্তু যখন এঁরা শিল্পী, যখন গায়ক বা নর্তক, বাদক বা কথক তখন মানুষ পাগলের মতো এদের কাছে ছুটে যেত, যেত প্রত্যাশা নিয়ে, যেত এমন কিছু পাবার আশায় যা সে পৃথিবীর অন্য কারুর কাছ থেকে পায় না। এসব শিল্পীরা হতেন বিদ্রোহী ও স্বাধীন। ধর্মীয় অনুশাসন মানতেন না, কোনো দল উপদলের ধারে কাছে যেতেন না। এঁরা নিজেদের সব সময় দূরে রাখতে চাইতেন সামাজিক ঘোঁট, দুর্নীতি ও কুৎসিত অনুষ্ঠান থেকে। এর ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের ভোগ করতে হত নির্যাতন। সে নির্যাতন সহ্য করার শক্তি তাদের থাকত। তারা তাদের চিন্তায়, কথায় ও আচরণে জীবনের মূল সত্যগুলোকে মানুষের সামনে খুলে মেলে ধরতেন এবং মিথ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন। পরিণামে এদের চরম দারিদ্রে নিমজ্জিত হতে হত। জীবনে বিশৃঙ্খলা নেমে আসত, অনেক শিল্পী পরিবার ধ্বংস হয়ে যেত। তাঁদের মৃত্যু হত অপরিচয়ের অন্ধকারে, তবু তাঁরা হার মানতেন না।

সব মানুষই সৃষ্টিশীল নয়। বিশ্বপ্রকৃতি সব মানুষের মধ্যে চিন্তা ও সৃষ্টির, কল্পনা ও হয়ে ওঠার বীজ বুনে দেয়নি। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে স্বাধীন হওয়ার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে। আর একদিকে রয়ে গেছে যেমন প্রচণ্ড ভয়, ভয়ে সে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক শৃঙ্খলায় নিজেকে আবদ্ধ করতে চায়, দলবদ্ধ বা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে বাঁচাতে চায় নিজেকে। আবার সে নিজেকে এই ভয় থেকে, এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়, সে কারণেই দেখা যায়, বেশির ভাগ মানুষ উপরে উপরে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুশাসনগুলো মেনে নেয় কিন্তু গোপনে তার বিপরীত কাজ করে। সে গোপনে ব্যভিচার করে, ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে সে অস্বীকার করতে চায়, মুক্তি পেতে চায়, উঁচু পদে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা গোপনে তার আদর্শকে থুতু দেয়, নিজের ঘরে একা আয়নায় নিজের মুখ নিজে ভেংচায় এবং হাসাহাসি করে। এটা পরিহাস হলেও, সত্য। মানুষ শিল্পীর কাছে যায়, শিল্পীর বিপুল স্বাধীনতার থেকে সামান্য অংশ হাত পেতে নিতে, সেই স্বাধীনতার অংশভাক নিজের মধ্যে ধারণ করে সে মুক্তি চায় আবহমান দাসত্ব থেকে, মুক্তি চায় সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে,

নিজেকে সে সচল করতে চায়, করতে চায় গতিশীল। ভয় কাটিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে চায়। ...এত কিছু যখন চায় মানুষ একজন শিল্পীর কাছে। তখন তারও দায়িত্ব আছে শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

পাঠক, আমি প্রায় আমার মূল জায়গায় এসে পড়েছি। আমি বলতে চাই, আজ আর শিল্পীরা বেঁচে থাকতে পারছে না। শিল্পীবলতে সমস্ত সৃষ্টিশীল সত্তার কথাই বলতে চাইছি। সৃষ্টিশীলতার মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা কম্প্রোমাইজ করেছে তারা আর শিল্পী থাকছে না। সৃষ্টি নয় অনাসৃষ্টি করে আবর্জনায় ভরিয়ে তুলছে তারা। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে, এই সময় তাই চায় মানুষ প্রচারযন্ত্রগুলো তারস্বরে তাদের নিয়েই চিৎকার করছে, যারা আবর্জনা উৎপাদনকারী। যারা একহাতে তাদের কুৎসিত রচনারাশি বাড়িয়ে দেয়, অন্যহাতে টাকা নেয়। বিকট উপভোক্তা সমাজ বিশাল মুখব্যাদান করে সেসব গ্রাস করে, হজম করে এবং পরমুহূর্তেই সেইসব রচনাকারদের ভুলে যায়। ভিতরের দিক থেকে দেখলে গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এখনও মানুষের একটা চেষ্টা রয়েছে বেঁচে থাকার জন্য, একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে সৃষ্টির জন্য শিল্পের জন্য। সে খুঁজে বেড়ায় অপরিচিত অথচ সৃষ্টিশীল সত্তাকে। শিল্পীকে। একজন ব্যক্তি মানুষকে। কিন্তু আজ অপরিচিত অথচ সৃষ্টিশীল থাকার জন্য, বলা যায়, প্রায় সাধনা করতে হয়। চূড়ান্ত ত্যাগ করতে হয়। কষ্ট করতে হয়। প্রশ্নটা এখানে এসে থম্‌কে দাঁড়ায় যে, যে মানুষ নিজেকে আড়ালে রেখে, প্রচার মাধ্যমের বাইরে থেকে সৃষ্টি করে যাচ্ছে সে বাঁচবে কেমন করে? যারা তার সৃষ্টির ভিতর বাঁচার—বেঁচে থাকার উপাদান সংগ্রহ করছে, তারা তো তাকে পরিবর্তে শুধু কৃতজ্ঞতা জানায়, সম্মান করে হয়তো বা না দেয় অর্থ, না জোগাতে পারে সৃষ্টির প্রেরণা। একটা সময় ছিল যখন একজন শিল্পী কম্প্রোমাইজ করেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। সে হয়তো যোগ দিত রাজসভায় কিংবা কোনো সম্রাটের দরবারে। তার সৃষ্টিশীলতাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হত না কারণ তখন শোষণ ছিল একমাত্রিক, এরকম বহুমাত্রিক ছিল না। সমাজে শুধু সারল্যই ছিল না, একটা দেশে বা সমাজে ছিল ভিন্ন ভিন্ন জগৎ, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের পাশেই ছিল নিরক্ষরদের সংস্কৃতি। দুটো ধারাই ছিল জীবন্ত। জয়দেব গোস্বামীর পাশে লালন ফকিরের থাকার কোনো অসুবিধে ছিল না, কেউ কারুর খোঁজ রাখারও প্রয়োজন বোধ করত না। আজ একটাই সংস্কৃতি যে সংস্কৃতির পিঠে সিলমোহর সেঁটে দিচ্ছে প্রচারযন্ত্রগুলো, সে দিকেই সবাই ধাবমান। রাজনীতিকে নির্ভর করে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল, ভিন্ন সংস্কৃতির সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ধোপে টিকল না গোঁড়ামির জন্য। যে বস্তু শিল্পের সঙ্গে খাপ খায় না তাকে জোর করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ঘৃণা ও ভয় করার জন্য। গড়ে উঠেছিল দু-চারটি আন্দোলনও, সে সব আন্দোলনের মৃত্যু হয়ে যায় নিছক প্রতিবাদ করতে গিয়ে। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যে এই অবস্থাকেই মেনে নেওয়া হয় এই বোধ প্রতিবাদকারীদের আজও হয়নি। প্রতিবাদ আজ একটি ভালো ও

নির্ভরযোগ্য পণ্য মাত্র।

শিল্প নিছক প্রতিবাদ নয়, সৃষ্টিশীলতা ইস্তেহার বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনা নয়। বরং তা এই পচনশীলতার মধ্যে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা অঙ্গীকার নিয়ে আসে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাকে কণ্ঠরোধ করে রাখতে চায়; তার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়, সে এ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ না করে পারে না। যদিও সেটা এক অসম লড়াই। বিকট প্রচার মাধ্যমগুলোর সঙ্গে তাকে যদি প্রকাশ্যে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তার পরাজয় অনিবার্য। তাকে তার নিজের জায়গা খুঁজে নিতে হয় আড়ালে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলিতে। সত্যি, শিল্পীকে আজ অন্ধকারেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সে একদিকে আত্মরক্ষা করে, অন্যদিকে সৃষ্টি করে যায়। অন্ধকার থেকেই তার যাত্রা শুরু করতে হবে। এবং সেখানেই তাকে একজন ব্যক্তি-শিল্পী হয়ে উঠতে হবে। সৃষ্টি তার কাছে হই চই নয়, শৌখিনতা নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কোনো বস্তু নয়, নয় পুরস্কার বা প্রচার-প্রত্যাশী তারল্য সৃষ্টি তার জীবনের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার মৃত্যুর পরও যা ক্রিয়াশীল থাকবে।

এই যে চারপাশে এত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাতায় সংখ্যাহীন গদ্য ও পদ্যের জন্মদাতা লেখক ও কবি, তাদের সবারই গতিমুখ দূরবর্তী প্রচারযন্ত্রের দিকে। কেউ তার কাছাকাছি যেতে পারে, কেউ পারে না, এবং গিয়েও কোনো লাভ হয় না। বাণিজ্য পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়, প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করে, দু-চারটে পুরস্কার ভাগ্যে জোটে আর অবশেষে হয়তো দেখা যায়, সেই 'সাহিত্যিক' বা 'কবি' তার জীবদ্দশাতেই বিস্মৃত প্রায়। কোনো ছাপই সে ফেলতে পারে না, সামান্য আঁচড় কাটতে পারে না সময়ের দূর বিস্তৃত শরীরে। এদের চেয়ে অপরিচিত ও অসফল স্রষ্টারা অনেকখানি সৌভাগ্যবান, তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সাফল্যের চেয়ে দূরে থেকেও। অবশ্য কথা এখানেই শেষ হয়ে যায় না, বরং এখান থেকেই শুরু হয়। শুরু করা প্রয়োজন। অমরত্বকে একদা বাতিল করা হয়েছিল নগদ বিদায়ের লোভে। তা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল একটা প্রজন্মের কাছে, আজ নগদ-বিদায়-লোভীদের দ্বারা সৃষ্ট আবর্জনার স্তূপে ঢাকা পড়ার উপক্রম হয়ে শিল্পমনস্ক মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে আবার অমরত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সে আর এই বিশৃঙ্খলার শিকার হতে চায় না, সে আন্তরিকভাবে সমস্ত সত্তা প্রয়োগ করে এমন কিছু করে যেতে চায় যার মধ্য দিয়ে আগামীকাল, বা পরশু বা তার পরের স্তরের মানুষের সাথে তার একটা যোগাযোগ ঘটবে। মোট কথা, সে বেঁচে থাকতে চায়। যে মৃত্যুর পর বাঁচে না, সে তার বেঁচে থাকা অবস্থারাও মূলত থাকে একটি সবল মৃতদেহ মাত্র।... তাহলে আজ কি প্রয়োজন নয় একজন শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখা? তার কাজ তাকে করতে দেওয়া? তার জন্য খাদ্য, পানীয় ও ন্যূনতম আস্তানার ব্যবস্থা করা? —যদি বেঁচে থাকার পক্ষে আমরা যেতে চাই, তাহলে তার প্রয়োজন আছে। যদি আমরা বেঁচে থাকার বিপক্ষে যেতে চাই তাহলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কম্প্রোমাইজ করে কুকুরদের সঙ্গে কুকুরদৌড়ে যোগ দিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে তা হয়নি, অসংখ্য সাহিত্য বা

শিল্পকর্মী স্রষ্টা ও সংগঠক অন্তঃসারশূন্য প্রচারসর্বস্ব সৃষ্টির পাশাপাশি ভিন্নতর সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নানা কারণে তারা ব্যর্থ হয়েছে সৃষ্টির দিক থেকেও, এটা সত্য তবে আমার কথা ধরাটা অব্যাহত আছে। নানা অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয়ে আজ মনে হচ্ছে ১. কে শিল্পী স্রষ্টা প্রথমে তা বুঝে নিতে হবে। ২. তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা চলবে না, বরং তার জন্য তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হবে। ৩. স্রষ্টাকে বাঁচার রসদ দিতে হবে?—কে দেবে এটা? দেবে সমর্পিতপ্রাণ সাহিত্য বা শিল্পকর্মীরা সংগঠকরা, যারা আদর্শ হিসেবে মেনে নেবে শিল্পকেই। শৈল্পিক আদর্শকেই।

পাঠক হয়তো হাস্যরোধ করছেন ঠোঁট টিপে। আমিও হাসি চাপছি এই লেখা লিখতে লিখতে। হয়তো ভাবছেন, আমি এক কাল্পনিক জগতের কথা বলছি। হ্যাঁ, তাই। একদিন স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যেই ছিল আজকের বহুলপ্রচারিত ধ্যানধারণাগুলো। সে গণতন্ত্রের কথাই বলুন আর সাম্যবাদের কথাই বলুন। ...চলুন, আমরা সৃষ্টিশীলতাকে বাঁচাতে ভিন্নতর কিছু ভাবি, অন্তত ভেবে সান্ত্বনা পাই।

আমি ভাবছি কমিউন গড়ার কথা, এটা নতুন কিছু নয়, অবশ্য। আবার নতুনও! ভাবছি আমাদের যে কমিউন গড়ে উঠবে তার আদর্শ হবে শিল্প রাজনীতি নয়। শৈল্পিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক একটি কমিউন, এক একটি কমিউনে সবাই সৃষ্টি হবে না, হতে পারে না। দু-এক জন থাকবে সৃষ্টিশীল। তাদের ঘিরে গড়ে উঠবে গহন অরণ্যের মধ্যে গাছের উঁচুদিকের ডালে ঝুলে থাকা মৌচাক। সেখানে রানী মৌমাছি ডিম দেয়, অন্যরা মধু সংগ্রহ করে। এটা ভাবতে ভালো লাগে যে মানুষ তার বাঁচার জন্য, ক্যারাভানের গতিমুখ ধ্বংসের দিক থেকে ফিরিয়ে সৃষ্টির দিকে করার জন্য, শিল্পের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে, স্রষ্টাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

বাস্তবে যে এর বিপরীত হচ্ছে, সে তো আমরা জানি। তবুও যারা পৃথিবী জুড়েই একটা উত্থানের চেষ্টা চলছে, চলছে কিছু হওয়ার প্রয়াস, সেটা হয়তো কোথাও কেউ একা করছে। কোথাও কয়েকজন মিলে। সৃষ্টিশীল হয়েও অপরিচিত থাকার মধ্যে যে যন্ত্রণা ও অবমাননা আছে তাকে ছাপিয়েও সে এমন কিছু পেয়ে যায়, যার কাছে পরিচিতি বা খ্যাতি তুচ্ছ, খুবই সাধারণ।

১৯৮৬

আধুনিকতার উত্তরাধিকার ও বিনয় মজুমদার

......

কবি কবি চেহারা এক কমবয়স্ক যুবক আমার কাছ থেকে র‍্যাঁবো নিয়ে যায়। জোর করেই নিয়ে যায়, বলে, দু-ঘণ্টা পর দিচ্ছি। সত্যি সে দু-ঘণ্টা পর বই হাতে, দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলে, এরকম লেখা আমিও লিখতে পারি, বাজি ধরুন, এই আমি লিখে দিচ্ছি। নির্বোধ এই ছেলেটির প্রাপ্য ছিল একটি চপেটাঘাত এবং পরে এক প্রবল ঘাড়ধাক্কা। কিন্তু হঠাৎ-ই আমার মনে হয়, যদি আমিও কিশোর বয়সে ফিরে যাই আর একা একা পড়ে উঠি বিনয় মজুমদারের কিছু কবিতা, তাহলে আমিও বলে উঠব বাহ্, এ লেখাতো আমিও লিখতে পারতাম। এই লেখা আমি কেন লিখিনি?—হ্যাঁ, বিনয় মজুমদার একটা সময়ে এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। সমস্ত জটিলতা অতিক্রম করে এক সরলতায়। যে সারল্য সব সৃষ্টিশীল কবি, শিল্পীর এক স্বপ্ন, এক দুর্লক্ষ্য হয়ে থাকে সারাজীবন। র‍্যাঁবো বলেছিলেন, 'সারল্য কাঁদাল আমায়'। ঈঙ্গিত এই সারল্য কি বিনয়ের সামনে কুয়াশা ও ধোঁয়াশাময় উন্মাদাগারের দরজা খুলে দিল?

বিনয় মজুমদার উন্মাদ হয়ে গেলেন কেন? বিশেষ করে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ 'ফিরে এসো চাকা'র প্রকাশের পর?—মনে হয় ওই গ্রন্থ লিখে ওঠার পরই তাঁর মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়। কেন? প্রেমে ব্যর্থ হয়ে? শুধু প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একজন আধুনিক মানুষ উন্মাদ হয় না আর আত্মহত্যাও করে না। এটা ঠিক কারণানুসন্ধান নয়, এ হল একজন কবির পেছনের প্রেক্ষাপটের আকাশে বাতাসে কোন বর্ণ ও গন্ধ আছে, তারই অনুসন্ধান। নজরুল উন্মাদ হয়েছিলেন রক্ত ও নার্ভঘটিত অসুখে। বিনয়ের উন্মাদ হওয়া সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং সময়েরও। যে সৃষ্টিশীল আত্মা তার নিজের সময় থেকে শুরু করে, তার বর্তমানকে, তার সমসাময়িক বোধ ও বিশৃঙ্খলাকে লেখায় তুলে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চোখ তুলে তাকায় বা পিছন ফিরে অতীতকে দেখে নেয়, তার সংকট আরও বেশি। বিগত শতাব্দীগুলোতে যে সব সফল কবি লেখকদের আমরা জানি, তাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তপ্ত বর্তমানকে কিছুটা জুড়োতে দিয়েছেন, অতীত হতে দিয়েছেন, তারপর তাদের সৃষ্টিতে সেই সময়কে এনেছেন। জীবনানন্দকেও তাঁর স্ব-সময় ক্ষতবিক্ষত করেছিল, অথচ তিনি শুরুতেই নিজের সময়ের বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় এনে কীভাবে শিল্পে রূপান্তরিত করা যায় তা জানতেন। তবু দ্বিধা, তবু সংশয়। বিনয় মজুমদার ও জীবনানন্দ পরবর্তী সময়কে বুঝেছেন, বুঝেছেন ক্ষত সেরে গেলেও ত্বক মসৃণ হয়ে থাকবে, তাতে রোমদ্গম হবে না। এই যে জানা, গভীরতর অন্তর্স্রোতকে জেনেও বিনয়ের

জিজ্ঞাসা ছিল ভবিষ্যতের অন্ধকারকে বিজ্ঞান কতটা আলোকিত করতে পারবে! সেই জিজ্ঞাসা ......

কম বয়সে আমি ভাবতাম, আঁর্তোর পর আর কোনো কবির উন্মাদ হওয়া চলবে না। কাফ্‌কার পর আর বিষণ্ণতা নয়। নয় ডস্টয়েভস্কির পর আর নির্বাসনও। নয় জীবনানন্দের সেই লাশকাটা ঘরের লোকটির মতো আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া। প্রতিটি স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে হবে, লিখে যেতে হবে, যদি তার লেখা কেউ না ছাপে তবুও। হয় লেখো বা আঁকো, নয় কারখানার ভোঁ বাজলে কারখানায় যাও। অন্য কোনো পথ নেই। এরকম ভাবতাম আমি। কিন্তু পৃথিবী ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসতে চায়, ঠিক সেই জায়গায় নয়, তবে সেই পুরনো সময়ের মতন নতুন সময়। বিনয় মজুমদারকে আমরা উন্মাদ হয়ে উন্মাদাগারেও যেতে দেখলাম। আর এই উন্মাদ অবস্থার মধ্যে তাঁকে লিখে যেতে হল জেলখানার অসুস্থ কয়েদির মতন, কাঠকয়লা দিয়ে রং-চটা দেয়ালে দেয়ালে।

বিনয় মজুমদারের জিজ্ঞাসা ছিল বিজ্ঞানের কাছে, কবিতার কাছে আর জীবনের কাছেও তিনি হতে পারতেন বৈজ্ঞানিক, তিনি হতে পারতেন খ্যাতনামা একজন গণিতজ্ঞ কিন্তু তিনি হয়ে উঠলেন অবশেষে এমনই একজন কবি, যিনি অসহায় অসুস্থ ও ভারসাম্যহীন। বিনয় যদি বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়ে সাহিত্যের ছাত্র হতেন, হয়তো বা তিনি সুস্থ থাকতেন। কিংবা কবিতার বীজ যদি তাঁর রক্তে প্রবেশ না করত! কবিত্ব তাঁকে বৈজ্ঞানিক হতে দেয়নি, বিজ্ঞান চেতনা তাঁকে কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশে এক অমোঘ বাধা দিয়েছে। এই দুই টানাপোড়েন-এর মধ্যেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর মানসিক ভারসাম্য। এর সঙ্গে আরও কিছু জটিলতা থাকবে, তবে এটা একটা বড় দিক, আমার মনে হয়। কবিতা ও বিজ্ঞান একমুখী হয়নি তাঁর ক্ষেত্রে, হয়েছে পরস্পর দুই বিপরীতমুখী তীব্র টান। বাইরের বাধা আত্মপ্রকাশকে দুর্বার করে, ভেতরের বাধা স্রষ্টাকে স্তিমিত ও দুর্বল করে দেয়। আঁতোয়া আঁর্তো কবিতা লিখতে বসে কী দুঃসহভাবে টের পেতেন তাঁর শব্দগুলো কেউ চুরি করে বসে আছে। কীরকম হতে পারে তাঁর সেই না-লেখা রাত্রিগুলো? প্রথম উদ্‌গীরণে আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে গেছে, তারপর জ্বালামুখের নীচে কঠিন একটা স্তর পড়ে গেছে, ভেতরের জ্বলন্ত লাভা টগ্‌বগ্ করে ফুটছে কিন্তু তা স্তরটা ফাটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। সে জানে, মুখটা সম্পূর্ণ খোলা, শুধু এটুকু চূর্ণ করতে পারলেই মুক্তি। সেটুকুই হয় না। 'ফিরে এসো চাকা'র পর কোন পথ? কোন দিকে? প্রকৃতি-পরিত্যক্ত শিশু এখন কী করবে?

বিনয় মজুমদারের পেছনে জীবনানন্দের মুখ উজ্জ্বল, এ তিনি অস্বীকার করেননি। জীবনানন্দকে নিয়ে একটি সনেটই তিনি লিখেছেন,

'ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিল, 'এই জন্ম দিন'

এই কবিতার শেষ দিকটা লক্ষ করার মতন,

'...সংশয়ে সন্দেহে দুলে দুলে
তুমি নিজে ঝরে গেছো, হরিতকী ফলের মতন'

এই অনুভব শুধু জীবনানন্দ সম্পর্কেই নয়, এ যেন তাঁর নিজের ভবিষ্যৎকে এক বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মধ্য দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দেখা। তাঁকেও ওইভাবে হরিতকি ফলের মত ঝরে যেতে হবে, সংশয়ে সন্দেহে দুলে দুলে, জীবনের শোভা দেখতে দেখতে। অথচ বিনয় মজুমদার জীবনানন্দের অনুকরণ করেননি। অনুসরণ করেছেন, এরকমও বলা যাবে না। যেমন রবীন্দ্র-অনুসারী কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি শুধু তাঁর সময়ে টের পেয়েছেন, জেনেছেন---তাঁর বোধ ও জ্ঞান দিয়ে, 'এখনো রয়েছে, চিরকাল রয়ে যাবে' বুঝেছেন 'সংগোপনে লিপ্সাময়ী' ওই চেতনাপ্রবাহ, ওই বোধ। এই যে জানা, তা অন্য কারুর কাছে তেমন স্পষ্ট ছিল না, তাঁর সম-সাময়িক কবি যাঁরা, তাঁদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ জীবনানন্দের দূর-প্রসারিত অদৃশ্য থাবার অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে টের পেয়েছিলেন মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এও ভেবেছেন এড়িয়ে যাওয়া যাবে এই আধুনিকতাকে, এই সময়কে। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'— এ যেমন নির্মম সত্য। তার চেয়েও নির্মম সত্য, সকল কবির সময়চেতনা থাকে না ভবিষ্যৎকে দেখার দৃষ্টি অতীতকে মুহূর্তে বুঝে নিয়ে আত্মস্থ হওয়ার। জীবনানন্দের সময়ের পর এটা কোন সময়? বিনয় মজুমদার বুঝেছিলেন, এ সময় নিজের কাছে সরে আসার, আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময়। বুঝেছিলেন 'ফিরে এসো চাকা' লিখতে শুরু করার আগে কিন্তু তারও পরে রয়ে গেছে দীর্ঘপথ...।

বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু এবং গদ্যলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—এই তিনজনই উঠে এসেছিলেন জীবনানন্দের জমি থেকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই তিনজনই সাহিত্যের নতুন রূপ কী হবে এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়েছেন। উৎপলকুমার বসু লেখা বন্ধ করেছেন। সন্দীপন সিরিয়াস লেখা ছেড়ে এমন কিছু লিখতে শুরু করেছেন, যা আমাদের কাজে লাগে না। আর বিনয় আধুনিকতাকে বর্জন করে প্রবেশ করতে চাইলেন ক্লাসিক চেতনায়। ''ফিরে এসো চাকা'র কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়েছে, অদ্ভুতভাবেই মনে পড়েছে মধুসূদনকে। তাঁর সেই ভাষার দৃঢ়তা, তাঁর সেই আত্মবিলাপ যেন এই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর রোমান্টিক চেতনার সাথে সাথে এক ক্লাসিক চেতনাও তলায় তলায় প্রবাহিত ছিল শুরু থেকেই। তবু বলা যায়, ''ফিরে এসো চাকা' লেখার সময় তাঁর বিশ্বাস ছিল আধুনিকতায় কিন্তু 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা'য় এসে সে বিশ্বাসটা ভেসে গেল মনে হয়। সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলেন 'মাংসরন্ধনকালীন গন্ধ'কে। ভুলে গেলেন 'বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন'। তিনি হতে চাইলেন সেই সৌন্দর্যের

পূজারী, যা ধ্রুপদি। কিন্তু আধুনিক মানুষ তো তা হতে পারে না। এক আকাশ ব্যর্থতা যেন তাকে গ্রাস করল!—আমি ভেবেছি এটা হল কেন? উত্তরটা তৎক্ষণাৎ খুঁজে পাইনি। পরে বুঝেছি, আমাদের কবিতায়, গদ্যে যতটা আধুনিকতা এসেছিল, সে তুলনায় আধুনিক জীবন গড়ে ওঠেনি। আধুনিকতা ছিল ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে। যে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে কবি শিল্পীরা উঠে আসেন, সেই সমাজ জীবনানন্দকে গ্রহণ করল ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম আগে বসিয়ে তারপর বসাল জীবনানন্দের নাম। তাঁকে এককভাবে গ্রহণ করল না। বরং বলা যায় তারা জীবনানন্দকে সম্মান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে মুখ ফেরাল, মানসিকভাবে আধুনিক জীবনের প্রতি তাদের আর আকর্ষণ রইল না। ধূর্জটিপ্রসাদ বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলায় কোনো ইন্টেলেক্চুয়াল ক্লাস গড়ে উঠল না। সেভাবেই বলা যায়, এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আধুনিকতার শিকড় প্রসারিত করতে পারল না। প্রশ্ন এসে যায়, আধুনিকতাটা কী?—আধুনিক জীবন, আধুনিক মানসিক জীবনটা কী? আমরা জীবনানন্দ থেকে যে কবিতার ধারা তাকে আধুনিক বলি। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে ও সমর সেন সম্পূর্ণ আধুনিক নন। তাঁরা আধুনিকতার সমসাময়িক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও। 'বোধ' 'আট বছর আগের একদিন' ও সোমেন পালিতের অনুভূতি ও জীবন জিজ্ঞাসা যে চেতনা থেকে উঠে এসেছিল, সেই চেতনা জীবনানন্দের সহযাত্রী অন্য কোনো কবির মানসিকতায় সম্পূর্ণভাবে ছিল না। আংশিকভাবে ছিল, টুকরো টুকরোভাবে। তাঁরা জীবনানন্দের সমসাময়িক এবং আধুনিকতারও। যা হোক, নতুন একটা চেতনা জন্ম নিল। নতুন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অনুভূতি ক্ষমতা ও উপলব্ধির ক্ষমতাও চলে আসে। এসে গেল। পার্থক্য হয়ে গেল রবীন্দ্রচেতনার সাথে। কিন্তু এই নতুন চেতনা, যার নাম আমরা দিয়েছি আধুনিকতা, তা আবদ্ধ থাকল একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে। এটাই নিয়ম, নতুনতর বোধ যখন প্রথম কোনো ব্যক্তি মানুষ নিয়ে আসে, তা প্রথমে ছোট একটি জায়গাতেই থাকে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দেখলাম, ডাবলিউ. বি. ইয়েটস্-এর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে জীবনানন্দ প্রবেশ করলেন আবহমান গ্রাম বাংলায়। লিখলেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। দেখা গেল, বিস্মিত হয়ে দেখা গেল, আমাদের গ্রাম-বাংলায় আধুনিকতার উপাদান রয়েছে, তাঁকে খুঁজে তুলে নিতে হবে। আধুনিকতার উৎস বিদেশ হলেও তার কাঁচামাল একেবারে ঘরের পাশের। জীবনানন্দের শৈশব ও কৈশোরের বরিশাল যথেষ্ট। তাকে নাগরিক হতে হবে না, তাকে কলকাতা শহরে এসে বাস করতে হবে না। বরং কলকাতার কবি সমর সেনের কবিতায় দেখা গেল চমক, চাতুর্য ও তারল্য। এক ফিকে আধুনিকতা। জীবনানন্দ আমাদের সামনে একজন আধুনিক মানুষকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি সোমেন পালিত। 'জুহু' কবিতার সোমেন পালিত প্রথম আধুনিক বাঙালি, কী দেখলাম আমরা?

'নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গোর চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে করে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই সকলকে
সম্বোধন ক'রে।
কখন সে বাজেট-মিটিং নারী, পার্টি পলিটিক্স, মাংস
মার্মালেড ছেড়ে,
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল;'

এবং

'—সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর? যেন তার, দুই গালে নিরুপম
দাঁড়িয়ে ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
বসে আছে—'

এই সেই 'পররতিময় আত্মক্রীড়' বাঙালি ভদ্রলোক। 'কলমকে খড়্গোর চেয়ে ব্যাপ্ত' মনে হয়েছিল যার। ভুল হয়েছিল। যে বিষণ্ণ বিমর্ষ পায়ে অতিক্রম করেছে, 'বাজেট মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস মার্মালেড'। তারপর? তারপর 'অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল'। আমরা হতবাক। কিন্তু এই আধুনিক মানুষটির জীবনে, এ যে নির্মম সত্য। তার দুই গালে দুই বৈবাহিক পেঁচা। মার্কস ও ফ্রয়েড। দুই বেয়াইমশাই, কেউ কারুর মুখ দেখেন না। অর্থ ও অনর্থ দুই পুত্র কন্যার সঙ্গে শুভাতীত পরিণয় ঘটিয়ে পৃথিবীর দুই পিঠে, দুই দিকে নিজের ঘরে বসে আছেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ, আবিষ্কার শেষ কিন্তু কোথাও তাঁদের আশ্রয় মেলেনি। এই ত্রিকালজ্ঞ পেচকদ্বয়কেও বহন করেন সোমেন পালিত। কবিতায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া না থাকলেও আমরা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, বাংলার এই যুবকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল দূর গ্রামে। তারপর, জীবনের বড় একটা অংশ তারই রাজধানী কলকাতায়। আজ সে 'সান্টাক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্নে জুহুর সমুদ্র পারে গিয়ে/ কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিল সূর্যের নিকটে গিয়ে.../সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে'।

আধুনিকতার প্রথম শর্ত যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস, যে সংশয়, সেখানেই সোমেন পালিত থেমে থাকেননি। হারিয়েছে সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। এমনকী 'প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে' আজ সমুদ্র ও সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্ন একটি মানুষ। আবার ফিরতে চায় বিশ্বাসে? এই সমুদ্র, সূর্য, ফেনা ও বালি এখানে নতজানু হবে সে? মিশে যাবে ভিড়ে, ফিরে যাবে প্রকৃতির কাছে? — না কোনোটাই সম্ভব নয় আর। তাই সে উপহাসিত। উপহাসিত মুন্সি, সাভারকর, নীরম্যান এইসব স্ট্যাচুদের দ্বারা। এই

তিন স্ট্যাচু, তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে কৌতুকের সঙ্গে দেখে গেল তাকে।

সোমেন পালিতের অগ্রজ যে, সেই 'আটবছর আগের একদিন'-এর অহেতুক-অতৃপ্ত নায়ক, আত্মহননকামী, যে পড়ে আছে লাশকাটা ঘরের নোংরা জড় টেবিলে জড় ও বীভৎস হয়ে, তাকে এখানে টেনে আনিনি। তাকে আমাদের আর কাজে লাগে না, যে আত্মহত্যা করে, পৃথিবী থেকে চলে যায়, শুধু তার বিধ্বংসী চেতনাটুকু আমাদের ঝাপ্টা বাতাসে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আমাদের কাজে লাগে যে বেঁচে আছে, তাকে। সোমেন পালিত যে সব কিছু হারিয়েছে সে কিন্তু কিছুই হারায়নি। সব কিছু হারিয়ে সে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে।

কেন সোমেন পালিতের এই দীর্ঘ অবতারণা—? আমি কি পাঠককে বোঝাতে পেরেছি জীবনানন্দ পরবর্তী আধুনিক জীবন, আধুনিক মানুষ ও লেখা কেমন হবে, কেমন হতে পারে তার আভাসমাত্র? আমি একটি ধারাবাহিকতা রাখতে চেয়েছি, যেটি স্বাভাবিক ও সত্য। আমাদের পূর্ববর্তী যারা, অর্থাৎ বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু ও গদ্যলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই আধুনিকতায় সব সময় বিশ্বাস রাখতে পারেননি। সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি, এটা কোন সময়। যে জন্যে এই সংকট। কারুর লেখা থেমে গেছে, কেউ শুধু একরকম 'স্টাইল'কেই লেখা বলে চালাতে চান। আর বিনয় মজুমদার, সারা জীবনের সুস্থতার বিনিময়েও কেন খুঁজে পান না কোনো স্থির বিশ্বাস? তাঁকেই আমরা সংশয়ে সন্দেহে দুলতে দেখি। একবার ভাবেন, আধুনিকতা সত্য, আরেকবার ধ্রুপদি চেতনা। বুঝতে পারেন না কোনদিকে যাবেন।

কিন্তু আমি যখন পড়ি তাঁর লেখা, তা একজন আধুনিক পাঠক হিসেবেই পড়ি। আমার জীবনের বাস্তবতা ও কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে।

দুই

'সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।'

আশৈশব আমি নদী,অরণ্য, ফসল, ফসলের মাঠ আর দূর দিগন্তরেখায় নীল পর্বতরেখা নিয়ে যে নিসর্গ তার মধ্যেই বাস করে আসছি। নদীর বুকের পাশে যে ভিজে বালি, তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেছি বাঁকের দিকে। মনে হয়েছে বাঁকটা ঘুরলেই আমি আবিষ্কার করব নদীগর্ভে নগ্ননীল পর্বতমালার পাথুরে শিকড়। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বৈশাখের স্বচ্ছ আকাশে কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর হেমন্তের আলো ছড়িয়ে পড়া সকালে, এত কাছে মনে হয়েছে সেই পর্বতমালাকে। রাতে, মাঠে ঝোপের পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে দেখেছি দূর-দূরান্তের নক্ষত্র, ছায়াপথ। প্রশ্ন করেছি নিজেকে, ওরা তোমার কে? তোমাকেও দেখছে ওরা? তুমি যেতে পারো ওদের কাছে? এসবের মধ্যে বাস করেও

ভুলে গেছি আকাশ, নক্ষত্র, নদী ও পর্বতমালাকে। ভুলে গেছি ফল, ফসল ও ফুলকে। আবার হয়তো কোনো এক মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়েছে এসব, ফিরে যেতে চেয়েছি কাছে। কিন্তু সমস্ত বিস্মৃতি ছাপিয়ে মনে যা উঠে আসে, তা আমার প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতার স্মৃতি। যার মধ্যে এই নদী পর্বত প্রান্তরের ও দূর নক্ষত্রাকাশের সৌন্দর্য নেই। যা সৌন্দর্যহীন কিন্তু মাদকতাময়। যে অভিজ্ঞতা চট্‌চটে আঠার মতো কিন্তু তা একমাত্র। আকর্ষণীয় মাংসরন্ধনকালীন গন্ধ।

সে ছিল এক গ্রীষ্মের দুপুর। আমার সেই বয়স, যে বয়সে কিশোর কিশোরীরা যৌনতাকে ঘৃণা করে। অপবিত্র মনে করে। অন্যসব কিশোরের মতো আমিও ভেবেছি, জীবনে বিবাহ নয়। আমিও নারীদের চোখের দিকে তাকাতে পারি না সোজাসুজি। তাদের থেকে দূরে থাকি। এমনকী কথা বলি না আমার দিদিস্থানীয়া যুবতীটির সঙ্গেও। যে মায়ের অসুস্থতার জন্য আমাদের রান্না করে খাওয়াচ্ছে। সংসারের কাজকর্ম করছে। আমিও টাইফয়েড থেকে উঠেছি কিছুদিন। আমার চেয়ে বয়সে বড়, নাম ছিল মায়া। আমি কথা না বললে কী হবে, সে আমাকে হাসাতে চায় নানান তুচ্ছ ও রসালো কথাবার্তা বলে। সে আমার পিছু নেয়। সেই দুপুরবেলা আমি যখন বইপত্র ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি নিঃসাড়ে, সেই ঘুমের মধ্যে সারা শরীরে এক চাপ অনুভব করি। ঘুমের ভিতর থেকে মনে হয়, একটা ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠা তুলোর পাহাড় আমাকে আপাদ-মস্তক নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছি আমি। ঘুম ভেঙে যায়, টের পাই ঝড় শুরু হয়ে গেছে, এক নগ্ন শরীরের ঝড়। গরম নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে আমার মুখের ওপর। মুহূর্তে বুঝে যাই সব। মায়ার নগ্ন শরীর আমার ওপর, ঘুমের মধ্যে আমাকেও সে নগ্ন করে দিয়েছে। অস্থির উত্তেজনায় কাঁপছে সে, কানের কাছে মুখ এনে কিছু বলতে চায়, পারে না। আমিও দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়ের মধ্যে ফুলি কিছুক্ষণ। কী করব বুঝতে পারি না। একদিকে শরীর জেগে উঠেছে, অন্যদিকে মন নিঃশব্দে চিৎকার করে ওঠে, না, না, না। কিন্তু সে তো তার উন্মাদনাকে এক জায়গায় থামিয়ে রাখতে পারে না। আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখে মায়া নিজেই শুরু করে দিয়েছে। মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত নিই, প্রচণ্ড এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিই, সে এটা ভাবতেই পারেনি। আমার শরীরের জেগে ওঠা দেখে মনে করেছে, আমার সম্মতি রয়েছে। এক অর্ধসঙ্গমের ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমি নিজেকে উদ্ধার করি। উঠে বসি। লাফিয়ে মেঝেতে নামি, দ্রুত পোশাক পরে নিই। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবার মুখে দেখি, মায়া দলাপাকানো একটি মাংসপিণ্ড হয়ে, এক কুকুরকুণ্ডলী হয়ে বিছানার কোণে পড়ে আছে। আমি তাকে ধ্বংস করেছি। কয়েকটা দিন দুজনে মুখোমুখি হই না আর, সে আমাকে ভাত বেড়ে দেয় আমি মুখ নিচু করে খাই, তার পায়ের পাতার দিকেও দেখি না। তীব্র ঘৃণার পরিবর্তে আমার মধ্যে অনুতাপ জমে ওঠে, আমার মনে হয় আমি তার প্রতি অবিচার করেছি। আমি ঠিক করিনি, ভুল করেছি। আমি নিজেকে, অক্ষম কাপুরুষ এইসব বলে গাল দিই। আমার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। বুঝি এক রহস্যময় জগতের দরজা

থেকে আমি নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি। আমি প্রায় ভেঙে পড়ি। অবশ্য বাইরে সেটা কাউকে বুঝতে দিই না। মায়া কিন্তু ভেঙে পড়ে না, ভেবেছিলাম, সে চলে যাবে আমাদের বাড়ি ছেড়ে। আমাকে ঘেন্না করে চলে যাবে। আমাকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে হাসবে কিংবা ভ্রূ কুঁচকে দু-চোখে বিষদৃষ্টি এনে তেরছা তাকাবে। কিন্তু সে থেকে যায় আমাদের এখানেই, আবার আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিতে চায়, করে নেয়, যেন ধীর চিকিৎসায় একজন রুগিকে সে সারিয়ে তুলেছে, এরকমভাবেই সে আমার ঘনিষ্ঠ হয় আবার। এর পরের এক রাত্রিবেলা সুযোগ পেয়ে যায় সে। আমিও যেন সেই সুযোগের অপেক্ষায়। আর কোনো প্রতিরোধ শক্তি নেই আমার। আমাদের মিলন হয় এক ভয়, অন্ধকার, ঘাম ও আঁশটে গন্ধের মধ্যে। দীর্ঘ মিলন। এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, মনে পড়েনি একে অন্যকে, কোনো বেদনাবোধ নেই, বিরহ নেই। হয়তো এ দেহই শুধু, শুধুই দেহ। তারপর জীবনের দীর্ঘপথ ধরে হেঁটে এসেছি।

> 'ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে
> অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
> ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
> আমারে সে ভালবাসিয়াছে
> আসিয়াছে কাছে
> উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
> ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে।'

তবু পাহাড়, নদী, প্রান্তর ও প্রেম অতিক্রম করে, ভুলে গিয়ে, আমি সেই স্মৃতির কাছে ফিরে যাই। একমাত্র তার কাছে। যে স্মৃতি আমার শুধুই 'মাংসরন্ধনকালীন' স্মৃতি।

> 'জীবনে ব্যর্থতা থাকে, অসম্পূর্ণ মেঘমালা থাকে
> বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো।'

'বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবনযাপন' করছেন কবি নিজেই। এখনও ফুরিয়ে যান নি তিনি। মৃত্যুতে হারিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর এই জাগ্রত জীবন। কিন্তু ওই লাইন দুটি পড়ার পর আমার সামনে ভেসে উঠেছিল টুনীবাবুর মুখ। এখনও ভুলতে পারি না তাকে। অল্প কয়েকবার দেখা হয়েছিল তার সাথে। প্রথমবার এই মফস্‌সল শহরের ভাটিখানায়। দু-বেলা। ভাটিখানাটি যথারীতি এক দরিদ্র গণিকাপল্লির মধ্যে, যেমন থাকে অন্যান্য ছোট শহরে। টুনীবাবু, আমার নামের সাথে পরিচিত, সেটা জানায়। জানায়, তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। কারণ সে দুপুরবেলাতেই মদ খেতে আসে। তার পোশাকি নাম, মানবকুমার, বলে সে। বলে, তার দুটো যাত্রা-নাটকের বই তার বন্ধু চুরি করে নিয়ে নিজের নামে

ছাপিয়েছে। সে দুটো তখনকার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় যাত্রাপালা। আমি উপভোগ করছিলাম তার কথাবার্তা। সে তখন চূড়ান্ত মাতাল, কিন্তু মাথা খাড়া রেখে নির্ভুল উচ্চারণেই কথা বলেছিল সে। কিছুক্ষণ পরেই একজন গৃহস্থ-রমণীকে দেখা যায় গণিকাপল্লির সীমানায়। সংকোচবশত সে গণিকাপল্লির মধ্যে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু তার মুখে উদ্বেগ ও লজ্জা। দু-একটি যুবককে কিছু বলে সে, তারা ছুটে আসে টুনীবাবুর কাছে। মহিলা, টুনীবাবুর স্ত্রী। টুনীবাবু ৬০ হাজার টাকায় তার দোকান বিক্রি করে এসে, সেই টাকা নিয়ে ভাটিখানায় এসে বসেছে। সে তার টাকার 'খুতি' কোমর থেকে খুলে, সেই টাকা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে নর্দমায়, রাস্তায় ও গলিতে। মাতাল, গণিকা ও বেজন্মা শিশুদের মধ্যে। একটুও মাতাল মনে হয় না তাকে।

এই ঘটনার আরও কিছুদিন পর তার সাথে দেখা। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ভেজা গামছা গায়ে জড়ানো, অন্য একটা ভেজা গামছা পরনে। কোনো ভূমিকা না করেই আমাকে বলে, 'আলেন'। 'কোথায়' 'কেন' এসব প্রশ্ন আর তাকে করি না, নীরবে পিছু নিই। সে হাঁটতে থাকে গণিকাপল্লির বিভিন্ন গলি দিয়ে। মেয়েরা তখন সবেমাত্র সেজেগুজে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। টুনীবাবুকে দেখে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত এক চঞ্চলতা দেখা দেয়। কেউ 'কাকু কোথায় যাবেন', কেউ, 'ভালো আছেন দাদা', কেউ 'তৃপ্তিকে একবার দেখে যান, ও হয়তো বাঁচবে না।' বলে কমবয়সি অনেকেই এসে নিচু হয়ে প্রণাম করল। টুনীবাবু কারুর কোনো কথার উত্তর দিল না, হাঁটাও থামল না। কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সামনের দিকে তাকিয়ে সে হেঁটে চলেছে। পেছন পেছন প্রায় অস্তিত্বহীন আমি। সব গলি ঘুরে এসে, যেখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়াই। টুনীবাবু মাথা সামান্য কাত করে, সামান্য হেসে, বিদায় নেয়। আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না। এরও অনেকদিন পর, তার সাথে দেখা হয় শহরের নতুন গজিয়ে ওঠা এক ব্যাঙ্কের সামনে, হাতে লটারির টিকিট। ছিন্ন পোশাক। ময়লা ন্যাকড়ার মতন ধুতি পরনে, মুখটা টক্‌টকে লাল, ফোলা। সে হাঁটতে পারছে না ঠিক মতন। অনেক কষ্টে নিজের শরীরটাকে আমার কাছে বয়ে এনে তোত্‌লিয়ে বলল, 'আমার প্যারালাইসিস অর্ধেক শরীর পড়ে গেছে...একটা টিকিট নেবেন।'

'বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো'

এই লাইনটিকে অনেকটা উল্টিয়ে দিয়ে মনে মনে বলে উঠলাম :

'অচেতন মোরগের নিদ্রিত নিষ্ফল জীবন ফুরালো'

যেন আরও বড় মহাকাশ খুলে গেল আমার সামনে। মহাশূন্যতা। যাকে আমরা কখনও তীব্রভাবে অনুভব করি। কখনও সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিই। মোরগের নিষ্ফলতা এত বেশি যে, প্রকৃতিও তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়নি, তার

রাত্রি-শেষ ঘোষণার জন্য। কতদূরে আলো তখনও কিন্তু সেই আলো আসছে, আসছে, আসছে। তার গন্ধ পাচ্ছে প্রকৃতি সন্তান যে, সে। তার আওয়াজ মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এই আনন্দসংবাদ দিতেও সে ব্যর্থ হয়েছে। ভুলে গেছে তার জীবনকে কিংবা রাতের শুরু থেকে সে জেগেছিল, কী ভয়ংকর সেই জেগে থাকা, যদি সে ঘুম থেকে জেগে না ওঠে, যদি সে দূরের আলো আওয়াজ শুনতে ভুল করে, সেজন্য সে আর ঘুমেও ঢলে পড়ে না। ঘুমের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে। প্রকৃতিকে আর বিশ্বাস করে না সে।

কিন্তু এর চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য বিনয়ের এই ভয়ংকর সৌন্দর্যময় ও জাগ্রত কবিতাবলির দু-একটি পংক্তিতে। আচ্ছন্ন পাঠক ভাবতে পারে, কবি তার জন্যই এ কবিতা লিখেছেন। আমি সেভাবেই পড়ি।

তিন

'...তবু হে সমুদ্র, এ অরণ্যে কান পেতে শোনো ঝিঁঝিঁ পোকাদের রব—যদিও এখানে মন সকল সময় এ বিষয়ে সচেতন থাকে না, তবুও এই কান্না চিরদিন এইভাবে র'য়ে যায়, তরুমর্মের মধ্যে অথবা আড়ালে।'

সমুদ্রকে অরণ্য ডেকেছেন কবি, অরণ্য এসে কান পেতে শুনতে বলেছেন—ঝিঁঝি পোকাদের রব। বই হাতে নিয়ে আমাকে যে কতক্ষণ বসে থাকতে হয় মফস্‌সলের এই ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে। আমি আমার ভেতরের ঝিঁঝি পোকাদের রব যেন কান পেতে শুনছি, তার অর্থ নিগূঢ় অর্থ এই প্রথম বুঝতে পারছি। গভীর অরণ্যে যে যায়নি কান পেতে শোনেনি সেই সম্মিলিত ঝিঁঝিদের একটানা রব, তাকে বোঝানো যাবে না সে কী জিনিস। জীবন-অরণ্যের ঝিল্লিরব যে শোনেনি, তাকেও বোঝানো যাবে না। 'তবুও এই কান্না চিরদিন এইভাবে র'য়ে যায়' যাবে যদি বোধহীন চেতনাহীন হয়ে আমাদের মন ঘুমিয়ে থাকে, যদি কেউ জেগে না থাকে তবুও তার কান্না সে কেঁদে যাবে। গভীর অরণ্যে ঢুকছে ট্রাক, একটি ট্রাকের সঙ্গে কিছু মানুষ। তারা অরণ্য থেকে কাঠের গুঁড়ি তুলে নিল ট্রাকে। ড্রাইভার জঙ্গলের মধ্যে বসে মদ্যপান করল, সিগারেট টানল আর কুলি কামিনদের সঙ্গে নানান ঠাট্টা রসিকতা করে আবার ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে ফিরে গেল। কেউ শুনল না ওই অরণ্য-ক্রন্দন। জীবন-অরণ্য থেকেও এইভাবে ফিরে ফিরে যাই আমরা। কিন্তু এ কোন সমুদ্র? যাকে কান পেতে শুনতে হবে জীবন ট্রাজেডি? এই অন্তহীন ও আগ্রাসী সমুদ্র কি নয় আসলে নিঃশব্দ নিস্তরঙ্গ সময়? সময় ও সমুদ্র এখানে মিলেমিশে গেছে। উন্মাদ কলরোল, আকাশ উঁচু ঢেউ-এর সাথে চিরনিস্তব্ধ, চিরতৃপ্ত সময় ও সমুদ্র নিজেকেই নিয়ে মগ্ন, নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ। চিরতৃপ্ত এই সময়কে অরণ্যে ডেকেছেন বিনয় মজুমদার, জীবন-অরণ্যে। তার ক্রন্দন তার অসম্পূর্ণতা যে তার তৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি কিছু, সেজন্যই ডেকেছেন।

আমরা যে আধুনিকতা পেয়েছিলাম সময়ের বিশেষ এক সন্ধিক্ষণ থেকে, সে তো থেমে থাকেনি। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকেনি। সোমেন পালিত যে আধুনিক মানুষ, তার উত্তরসূরিদের মধ্যে চেতনার আরও কিছু প্রবেশ করেছে। বিনয় মজুমদার আধুনিকতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেননি, ফিরে এসেছেন নিজের জায়গায়, আধুনিকতায়, সেখানে তার আশ্রয় মেলেনি। দ্বিধা ও সংশয় তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। তবু বলব তিনি তাঁর সময়ে আধুনিকতার এক অনন্য উত্তরসূরি। একমাত্র তিনি। আর সবাই সরে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে। বিনয় মজুমদারের পর বাংলা কবিতার আর কোনো পিছুটান থাকল না, ক্লাসিকের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকল না। তার পথ সামনের দিকে।

১৯৮৮

ফাল্‌গুনী রায় ও আমার ব্যক্তিগত মধ্যরাত

......

ফাল্‌গুনী রায় এই সময়ের একজন কবি।

ফাল্‌গুনী হাংরি। বিশাল ভগ্নস্তূপের সামনে, ফটকে দাঁড়িয়েছিল ফ্যাকাশে ও ফোলা ফোলা চেহারার একজন প্রায় বামন। মুখ ভর্তি আধ আঙুল লম্বা লম্বা কাঁচা ও পাকা দাড়ি, সে হাঁ করে গলার মধ্যে ওষুধ স্প্রে করে দিচ্ছিল! লোকটি হাঁপানিগ্রস্ত। শৈলেশ্বর দূর থেকেই চিনিয়ে দেয় তাকে, ফাল্‌গুনীর বড় ভাই'। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায়, 'সাবধান, আমার নাম উচ্চারণ করবে না, আমাদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য ওকে বাড়িতে প্রহার পর্যন্ত করা হয়...'বলে। হ্যাঁ, শৈলেশ্বর 'প্রহার' শব্দটাই ব্যবহার করেছিল, 'মারধর' নয় 'প্রহার'। 'ইনি কুচবিহার থেকে এসেছেন, একটা কাগজ বের করেন, ফাল্‌গুনীর সঙ্গে দেখা করতে চান...' শৈলেশ্বর দ্রুত কেটে পড়ে। সেই ভর দুপুরবেলা বাড়িতে ছিল না সে, 'বোধহয় কাছেপিঠে কোথাও আছে, এসে পড়বে—আসুন'—লোকটি আমাকে পাশে নিয়ে বাড়ির ভেতরের বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকে। সবদিক থেকে একটি প্রতীকী পোড়ো-বাড়ি যা এককালে ছিল প্রাসাদ, যেখানে এখন এসে আশ্রয় নিতে পারে রাস্তার বেশ্যা ও বখে যাওয়া ছোকরার দল, জুয়াড়ি ও নেশুড়েরা, সার সার ট্রাক থামিয়ে অবাঙালি ড্রাইভাররা যেখানে খুব সহজেই খুঁজে পেত তাদের কম বয়সের সমকামী সঙ্গী, সেখানেই ফাল্‌গুনী থাকে। ফাল্‌গুনী, তার মা ও দাদারা। আমি তার সঙ্গে সিঁড়ি ধরে ওপরতলায় উঠে যাই, ঘরের পর ঘর পেরিয়ে, প্রতিটি ঘরই ভেতর থেকে বন্ধ, সেই ভেতর থেকে বন্ধ ঘরগুলি পেরিয়ে অবশেষে একটা হা-খোলা ঘর। দরজায় সে দাঁড়িয়ে পড়ে, আঙুল তুলে ভেতরটা দেখিয়ে, 'ওইটাই ফাল্‌গুনীর ঘর, বসুন, এসে পড়বে এক্ষুনি।'

মেঝের ওপর তোশক জাতীয় কিছু একটা পাতা ছিল, তোশকের ওপর চাদরও। বালিশের মতন কিছু একটা ছিল। অবশ্য এসব আমাকে ধারণা করে নিতে হয়। আসলে যা ছিল তা হল মোজাইক করা মেঝের ওপর চার বাই নয়, নয়তো ছয় বাই এগারো ফুট একখণ্ড অ-কৃত্রিম মাটি। এই পোড়ো রাজবাড়ির দোতলার একটি ঘরের মধ্যে চাষ করার পর মই দিয়ে সমান করা একটুকরো ভুঁই, কেউ তুলে এনে পেতে দিয়েছে। আর চারকোণা ছাই রঙের একটা পাথরের টুকরো যেটাকে আমি বালিশ ভেবেছিলাম। বসে পড়ি সেই পবিত্র জমিতে। দেয়াল ঘেঁষে ৭০/৭৫ বছর আগের দুটো কব্জাবিহীন ট্রাঙ্ক, মরচে পড়া রংটাই যার আসল রং। ট্রাঙ্কদুটোর ফাঁকফোকর দিয়ে কাগজপত্র উঁকি দিচ্ছিল। বুঝলাম, ফাল্‌গুনীর পাণ্ডুলিপি বইপত্র যা কিছু ও দুটোর গর্ভেই আছে। এ ছাড়াও ছিল, আলনার

মতো একটা ব্যাপার, সেটা কিন্তু একেবারে শূন্য ও কাত হয়ে পড়েছিল একপাশে। সন্ন্যাসীর আলখাল্লা বা ফতুয়ার মতন কিছু ছড়ানো ছেটানো ছিল তার চারপাশে। বসেছিলাম, বসে থাকতে থাকতে আমার সিগারেটের কথা মনে পড়ে যায়। চার্মিনার ও দেশলাই দুটোই ছিল সঙ্গে, বেরও করেছিলাম পকেট থেকে কিন্তু ধরাইনি। ধরাবার সাহস হয়নি। চার্মিনার ধরিয়ে সেই ঘরের পবিত্রতা আমি নষ্ট করতে চাইনি।

আমাদের দেশের কবিরা প্রতি দশ বছরের গোড়ায় জন্ম নেয়, পরে দশ বছরের শেষে মরে যায়। ওই দশ বছরের মধ্যে ওদের যা কিছু, দাপাদাপি, যৌনকাতর সারমেয়ের চিড়িক-বিড়িক পেচ্ছাপের মতন হা-হুতাশ ভরা লিরিক পদ্য লেখা, পদ্যের কাগজ ও বই বের করা ও দাদা বাবাদের ধরে করে দু-একটা সংকলনে একটু ঠাঁই করে নেয়া। এই শেষ। ফাল্‌গুনী দশ বছরী কবি নয়, তাকে ওইসব দশকের মধ্যে কেউ টেনে এনেছে বলে শুনিনি, টেনে আনতে সাহস পায়নি। খুব সম্ভব কোনো সংকলনেই, বিশেষ করে 'ওইসব' সংকলনে তার জায়গা হয়নি। তাকে কবি বলেই মানতেই চায়নি শহর ও মফস্‌সলের ন্যালা খ্যাপার দল। শেয়ালের গান শেয়ালের কাছে বোধগম্য, তারা কাছাকাছি চলে আসে পরস্পরের আর গলা মেলায়। সিংহের গর্জনকে তারা ভয় পায় ও ব্যঙ্গ করে। ফাল্‌গুনীর কবিতায় সেই গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম।

সেই অর্থে ফাল্‌গুনী 'কবিতা' লিখতে চায়নি, যে অর্থে কবিতা লেখা মানে কাব্যচর্চা করা। আবার সে শুধুই নালিশ জানাবার জন্য, অভিযোগ করার জন্যই লেখেনি। ক্রোধ ছিল তার, দুঃখ ও রাগ। দুঃখ, ক্রোধ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ইচ্ছা—প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা —মিলেমিশে কোথাও গর্জন কোথাও সাবলীল সুরে গেয়ে যাওয়া গান সে তার জীবনকে যতটা পেরেছে সৎ ও অগোছালভাবে খুলেমেলে ধরেছে। কারণ জীবন ওইরকমই। প্রথমেই সে জানিয়ে দিয়েছে তার কোনো মূল্যবোধ অবশিষ্ট নেই আর, মূলত নীতি ও মূল্যবোধগুলো ধ্বংস হয় যেখানে, সেখান থেকেই প্রকৃত লেখালেখি শুরু হয়। আবর্জনা সরিয়ে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার রাস্তা করে নেবার চেষ্টা করা যায় অনুপস্থিত ও অদৃশ্য কবির সঙ্গে আমি মজাদার সংলাপে মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু সময়ের জন্য আমি হয়ে গেলাম তার 'অভিভাবক'—সেই, 'অভিভাবক' যে তাকে প্রহার করেছিল।

আমি (অভিভাবকের ভূমিকায়)...হেঁয়ালি রাখ, জবাব দে আমাকে—আমাদের এরকম অপদস্থ করার অর্থ কী?

ফাল্‌গুনী : 'বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ'।

আমি : ছি ছি, ভাবতে পারিনি, আমাদের পরিবারে একই মায়ের পেট থেকে এমনি এক লেখা কাকে বলে জানিস্...শব্দ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে তোর...?

ফাল্‌গুনী : 'আমি ভাইফোঁটার দিন হেঁটে বেড়াই বেশ্যাপাড়ায়'

আমি : কী চাস তুই? কী?

ফাল্‌গুনী : 'আমি জন্মাবার আগের মুহূর্তে আমি জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি...'

আমি : এর চেয়ে হতিস যদি রাস্তার মোড়ের বখাটে ছোক্‌রা—মস্তান—

ফাল্‌গুনী : 'আমি দেখেছি আমার ভেতর এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম'।

আমি : অন্য যে-কোনো একটা পথ বেছে নে, যে-কোনো একটা—

ফালগুনী : 'আমি এক পরিত্রাণহীন নিয়তিলিপ্ত মানুষ।'

আমি : একজন বিপ্লবী হতেও মুরোদ লাগে, বুঝলি, পুলিশের গুলিতে রাস্তায় মরে পড়ে থাকলেও আমাদের একটা গর্ব থাকত, দু-চারজনকে বলতে পারতাম, ভুল পথ হোক—আর যাই হোক—আমার ভাই তবু একটা আদর্শের জন্য...

ফাল্‌গুনী : 'না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোনো...'

আমি : অপদার্থ, সৌন্দর্য...বুঝিস?

ফাল্‌গুনী : 'আমি এক সৌন্দর্য রাক্ষস...'

...এইসব আর কী, কারণ ফাল্‌গুনী ফিরতে খুবই দেরি করছিল।

বেশ্যার নাং হয়ে জীবনযাপনের কথা ভাবে সে, লিখছে ফাল্‌গুনী 'অলস বদ্মাস আমি মাঝে মাঝে বেশ্যার নাং হয়ে জীবনযাপনের কথা ভাবি...'। বেশ্যার নাং ও গণিকার অন্নদাস হয়ে বেঁচে থাকা, এইভাবে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা কিশোর বয়েস থেকেই আমাদের। কেন না 'আমার নিজের কোনো বিশ্বাস নেই কাউর ওপর'এই কথাগুলো এতটাই সহজভাবে উচ্চারণ করে সে যে বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। না, তার কোনো বাণী দেবার আকাঙ্ক্ষা নাই, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়ার কোনো সর্টকাট পথ সে বাতলে দেয় না। সে শুধু তার কথাই বলে যায় স্বাভাবিক গলায়। সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে, প্রতিটি পাত্রই নিঃশেষ, হা-খোলা প্রতিটি গহ্বর, অথচ এ কারণে এ জন্যে কারুর দরবারে তার নালিশ জানাবার নেই। সে মেনে নেয়, যেভাবে মেনে নিয়েছে ওই বাড়ি ও বাবা মা ভাইদের। মেনে নিয়েছে কিন্তু ওদের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই সম্পর্ক নেই তার এ বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে, দেখা হলে বুঝতে পারি ব্যাপারটা কতখানি সত্য। চাকরই তার খাবার দিয়ে যায় ঘরে, অথবা সেই বিশাল ধ্বসে পড়া বাড়ির কোনো একটা কোণে বসে খেয়ে নেয় সে, একা মাথা হেঁট করে। বাড়ির কিছু মহিলা আছে যারা রূপসি ও শৌখিন, তাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার ঠিকঠাক সেটাও ফাল্‌গুনী জানে না—সহজ স্বাভাবিক একটা পদ্ধতিতেই সে পরিত্যক্ত। আর 'পরিত্যক্ত' শব্দটির মধ্যে যে বিষাদ ও বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমান, ফাল্‌গুনীর বেলাতেও যে তা একেবারেই নেই—তা নয়, তবু এটাই যেন হওয়ার ছিল, হ্যাঁ এই তো নিয়ম। সে কারণেই সে লিখতে পারে, 'রবীন্দ্রসদনে

কবি সম্মেলন আর বৈজয়ন্তীমালার নাচ হল—আমার ত হল না কিছুই—উত্তরণ—অবনতি কোনো'। কোনো উত্তরণ বা অবনতি হওয়ার নেই, বেশ্যার নাঙের তা হয় না। গণিকার অন্নদাসও গণিকা, সে-ও চলে আসে একইরকম গণিকা-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, এইখানে। বেশ্যা যখন ঘরে লোক আনে তখন সে রাস্তায় বেরিয়ে যায়, ঘোরে পথে পথে, সে দেখে শহর ও সমাজ 'যার এক পাশে প্রসূতিসদন অন্য পাশে শ্মশানঘাট'...সবকিছুই তার কাছে উল্টোপাল্টা ও মজার। 'গণিকার বাথরুম থেকে প্রেমিকার বিছানার দিকে অনায়াস যাতায়াত—'শেষ হয় না শেষ পর্যন্ত। নিজেকে মৃত ভেবে নিয়ে সবার থেকে আলাদা ও ভিন্ন রকমভাবে জীবিত থাকে সে। সমস্ত গতানুগতিকতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, আর কোনোভাবেই যুক্ত নেই এই গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে—বাইরে থেকে সে ওইসবগুলোর দিকে তাকায় আর হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি করে কিন্তু নিজের জীবনের ভার নিজেকেই বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে—কোথায় যাবে সে? কোন মাটিতে শেকড় চালিয়ে দেবে?...সে খুঁজে বেড়ায়...

এই যে মধ্যরাত, কলকাতা নামক কবি উন্মাদ আর সভ্যতার জারজ সন্তানদের শহর থেকে অনেক দূরে এই মধ্যরাতে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস অবহেলা করে ফাল্গুনী সম্পর্কে ভাবছি, লিখছি ও মনে করতে চাইছি : হাওড়া ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কীভাবে সে আমার হাত টেনে নিয়েছিল তার হাতে, নীরবে। তার মুখ থেকে শোনা কলকাতার বর্ণনা...বাসে যেতে যেতে সে আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছিল...জোড়াসাঁকো; ওই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি, পাশেই বেশ্যপাড়া...। বড়বাজারের এক পানের দোকান থেকে হলদে রঙের জলে ভর্তি একটা গ্লাস সে তুলে নেয়, অন্য হাতে দোকানির কাছ থেকে নেয় দু-তিনটে কাগজের পুঁটুলি, সিদ্ধি। জলে গুলে খেয়ে নেয়। সস্তার নেশা। '১-২৫-এ এত চমৎকার নেশা কল্পনা করা যায় না' বলে। বুঝতে পারি ওই পয়সাকটাই ছিল তার কাছে, যা সে হাত খরচার জন্য বাড়ি থেকে নিয়মমাফিক পেয়ে থাকে।...আমি এইসব মনে করবার 'চেষ্টা' করছি না, সত্যি ফাল্গুনী আমাকে কোনোকালেই অনুরোধ করেনি—করতে পারে না তার লেখা সম্পর্কে লিখতে। আমি লিখছি আমার জন্য, আমি তাকে মনে করছি করতে পারছি নিজের ওপর কোনো চাপ না দিয়েই, আমি ভাবছি আমার জন্যই। তার কবিতা পড়ার পর, কবিতা পড়ার পর ফাল্গুনীর মুখোমুখি হওয়া, পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া আর আমাদের সেই দেখা হওয়া আচমকা হলেও, গোড়া থেকে শেষ অব্দি ছিল একেবারেই ঘটনাহীন, নীরবতায় ভরা আর সেজন্যই উত্তেজনায় ঠাসা। তখনই আমার মনে হয়েছিল, আমাকে লিখতে হবে, ধরে রাখার সামান্য চেষ্টা করতে হবে। সেই চুয়াত্তরের নভেম্বর, ছ'বছর আগেকার এক দুপুরবেলা থেকে রাত অব্দি...। হ্যাঁ, আমি আমার জন্যই লিখলাম এই লেখা, ফাল্গুনী ও তার লেখাকে নিজের কাছে খানিকটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করার জন্য। সে যে পরিচিত ও অবজ্ঞাত, এইজন্যই আমার ঝোঁক বা টান তার বা তার লেখার

দিকে তা তো নয়। এমনকী বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ একজন কবিও সে নয়, কোনো মূল্যই নেই এইসব বিশেষণগুলোর। সে অপরিচিত ও স্বাধীন। আমি তার কাছে গিয়েছিলাম, কথা বলেছিলাম একটি মাত্র কারণেই সে তার জীবনকে নিয়ে এসেছিল, নিয়ে আসতে পেরেছিল তার লেখায়—সরাসরি...যেন আক্ষরিক অর্থেই রাস্তার এক ভিখিরি গণিকা, যে ধর্ষিতা হওয়ার সময়েও আবর্জনা স্তূপ থেকে তুলে নিয়েছে ভাঙা ড্রাম নয়তো ফুটো থালা নয়তো অব্যবহৃত ফেলে দেওয়া বেহালা, সে তার গান গেয়ে চলেছে। তার জীবনের গান।

১৯৭৫

দুঃস্বপ্ন বিষয়ক গদ্য

......

জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো দু-ভাইকে পাশাপাশি বসিয়ে জ্যাঠামশাই উবু হয়ে জিজ্ঞেস করেন, বড় হয়ে তোরা কী হবি?

একজন সে-সময়ের শেখানো বুলি বমি করে দেয়, বুক ফুলিয়ে বলে, বড় হয়ে আমি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হব। উল্লসিত জ্যাঠামশাই। উল্লসিত তাঁর পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা শুনে।

বাহ্। বাহ্। এই তো চাই। হেঃ হেঃ।

অন্যজন বিষণ্ণ—বিষণ্ণ কেননা শেখানো মিথ্যে বুলি অসহ্য তার কাছে—ঘেন্নায় তার চোখ-মুখ কুঁচকে আছে।

চোখ ফিরিয়ে সে দূর মাঠের দিকে তাকায়—মাঘ মাসের কুয়াশা ছিঁড়ে রোদ এসে পড়েছে কুলঝোপে, বিন্না আর এলুয়া ঘাসের ছাড়া ছাড়া জঙ্গলে। মাকড়সার পাতা জাল যত—শিশিরে কুয়াশায় ভরে আছে—ভোরের শিরশিরে বাতাসে দোল খাওয়া সেইসব অলৌকিক জালে জালে আটকে আছে সকালবেলার সূর্য। জ্যাঠামশাই ঠেলা দেয় তাকে, কীরে তুই চুপ করে আছিস কেন?

আমি কিছু হব না। বিরক্ত-বিমর্ষ মুখে জবাব দেয় সে, জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কী! কী! বললি? স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ জ্যাঠামশাই তার ভ্রাতৃবধূকে ডেকে বলে মণি শোনো শোনো, তোমার ছেলে কী বলছে!

ও ওইরকমই। কলতলা থেকে একটি রমণীকণ্ঠ, ম্যাদামারা।

ওকে আপনে বুঝাইতে পারবেন না।

শুরু হয়ে যায় তিরস্কার পর্ব।

ছেলেটি অবশ্য ততক্ষণে বারান্দা থেকে নেমে ধরেছে মাঠের আলপথ। ঘেন্নায় অপমানে জ্বলন্ত-চক্ষু ন-দশ বছরের ছেলেটি তার অজান্তেই পুরো নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে নিক্ষেপ করেছে নামহীন সেই মধ্যবর্তী নরকে—যার উল্লেখ করেছিলেন কবি দান্তে। সেই নরক উদ্ভাসিত হল কতদিন পর :

> তারা গিয়ে মেশে সেই বেসুরো সঙ্গীতে
> যে সঙ্গীত গায় দীন দেবদূত যারা
> স্বার্থলীন—না বিদ্রোহী, না বীর ভক্তিতে

প্রবেশ নিষেধ স্বর্গে, পাছে করে তারা
স্বর্গ কলঙ্কিত; নেই নরকেও ঠাঁই
স্পর্শে পাছে শুদ্ধ হয় নরকের ধারা।

এই যে ছিট্‌কে গেলাম, নিজের অজান্তেই নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম ছোট মানুষের ছোট ছোট্ সাধ-আহ্লাদ থেকে—সেখানে আর ফেরা হয়নি। ফেরা যায়ও না। স্বেচ্ছা নির্বাসিত মানুষকে সাধনা করতে হয় ব্যর্থতার, তাকে ঘিরে ধরে কালের দুঃস্বপ্ন। আমার স্বপ্ন আর বাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

কম বয়সে ভাবতাম, যে বা যারা এই সমাজ কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়, যারা বিদ্রোহী—অচেতন বা সচেতন যেভাবেই হোক না কেন—তারা প্রত্যেকেই বুঝি স্বপ্ন দ্যাখে—স্বপ্ন দ্যাখে আমার মতো দূর নক্ষত্রের কাছে যাওয়ার, স্বপ্ন দ্যাখে একজন সৃজনশীল মানুষ হওয়ার। আমি তাদেরই খুঁজি যারা নষ্ট-দুষ্ট, যারা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

যেমন যোগেশ।

তার থাকার মধ্যে ছিল বিধবা মা আর জ্যাঠামশাই। জন্মের পর বাবাকে সে চোখে দেখেনি, জ্যাঠামশাই ওকে মানুষ করেছে। সেই জ্যাঠামশাই যখন প্রবল জ্বরের ঘোরে ওর কাছে জল খেতে চায় তখন সে একটি গ্লাসে নিজের পেচ্ছাপ ভর্তি করে নিয়ে তাকে পান করতে দেয়। ১০৪° ডিগ্রি জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ফেনা ওঠা সেই লালচে পেচ্ছাপ খেয়েও নেয়। যোগেশ কেন এই কাণ্ড করল সে জানে না। আমি ওকে বললাম, তুই এই ব্যাপারটা নিয়ে দু-পৃষ্ঠার একটা গদ্য লিখে ফেল না।

ও বলল, লিখব।

যেমন মৈনুদ্দি।

মৈনুদ্দির বাপ ছিল মাঝারি মাপের জোতদার। জোতজমা বেশি থাকলে স্ত্রী ও বাচ্চাকাচ্চার সংখ্যা বেশি হবে না কেন। মৈনুদ্দির বাপের বউ ছিল চারজন। ভাই-বোন আঠাশ কী উনত্রিশ। মৈনুদ্দি হাইস্কুলে পড়ত, অবশ্য তার বাপের পছন্দ ছিল না ওইসব পড়ালিখা, সে তাকে একপাল গরুর সঙ্গে পাঠাত দূরের ঘাসের মাঠে, গরু চরাতে। গরু নিয়ে সারাটা দিন মাঠে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর বাপের ঠ্যাঙানি খেত, গরুগুলোর ভালোরকম পেট ভরেনি বলে। বাপের হাতে পিটুনি খেতে খেতে হঠাৎই একদিন সে রুখে দাঁড়াল। গরুর খুঁট দিয়েই প্রত্যাঘাত করল বাপকেই। বাড়ি জুড়ে—গ্রাম ও এলাকা জুড়ে এক বিশাল হই হই, কী না মৈনুদ্দি তার বাপকে মেরেছে!—

আমি মৈনুদ্দিকে বললাম, তুই তোর পরিবার আর জীবন নিয়েই ছোট একটা গদ্যই হোক আর বড় একটা পদ্যই হোক লিখে ফেল।

যেমন জহিরুল।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই জহিরুলের আঁকার হাত ছিল দারুণ। অথচ সে ছিল হাড়-হাভাতে একটি নিরক্ষর পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত সদস্য। তার মায়ের নাম ছিল চৌদ্দমনী, লিক্‌লিকে চেহারার কালো চিম্‌সে হাড্ডিসর্বস্ব একজন মহিলাকে গাঁয়ের লোক হয়তো বিদ্রূপ করেই নাম দিয়েছিল চৌদ্দমনী—যার আসল ওজন চোদ্দ সেরও নয়। যা হোক, জহিরুলের মা ছিল এলাকার নাম-ডাকওলা বৈদ্য, সে তুকতাক জানত, জল-পড়া দিত, দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিত রোগীর গায়ে হাত বুলিয়েই। জহিরুলদের বাড়ির উঠোনে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত, জহিরুল সেইসব রোগীদের ছবি আঁকত কাঠ কয়লায়। আমি তাকে দিতে শুরু করি চিত্রকলার পাঠ। গোইয়া, রেমব্রান্ট, ভ্যানগগ্‌, পল গ্যাঁগা, সেজানের ছবি দেখাই তাকে, বোঝাই, তোকে বড় আর্টিস্ট হতে হবে।

সেই জহিরুল কলেজের পড়া অসম্পূর্ণ রেখেই চলে যায় দূর সীমান্তের কাছে ছোট একটা চাকরি নিয়ে, সেখানে সে লজিং থাকত এক ধনী কৃষকের বাড়িতে। সে বাড়ির কর্ত্রী, তার প্রায় মায়ের বয়সি, ধবধবে ফর্সা, প্রশস্ত ও ব্যাপ্ত সেই পাঠান মহিলার জালে সে জড়িয়ে যায়। সে মহিলার গোপন দাবি ছিল প্রতি রাতে যৌন সঙ্গমে তৃপ্ত করতে হবে। যদি সে তার প্রস্তাবে রাজি না হয় তাহলে তাকে খুন হতে হবে। সীমান্তে হর-হামেশা খুন হত। এক দেশে খুন করে খুনিরা লাশকে অন্য দেশের জমিতে ফেলে আসত। ঝামেলা চুকে যেত।

জহিরুল শুকনো-করুণ মুখ করে তার সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনাত। মাংসল লোভ ও উল্লাসের সঙ্গে কীভাবে মিলেমিশে ছিল নিদারুণ মৃত্যুভয়! হয় সে স্ত্রীলোকটির ভাড়াটে খুনির হাতে নতুবা তার স্বামী বা ছেলেদের নিয়োগ করা গুণ্ডার হাতে খুন হবে জেনেও, অন্ধকার বাঁশবনে কীভাবে সে উন্মোচিত করেছে নারীর অপরূপ জঘনদেশ, জোনাকির যোনি থেকে বিচ্ছুরিত হয় নীলাভ আলো, আর তার উরুসন্ধি থেকে ছড়িয়ে পড়ত জ্যোৎস্না-সদৃশ অলৌকিক এক আলো—বলতে বলতে দুই হাতে এমন একটা ভঙ্গি করতে। জহিরুল, যেন সত্যি বৃত্তাকারে বিচ্ছুরিত সেই আলোর ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সোল্লাসে জহিরুলকে বলি, তুই ওই মহিলার একটা ছবি এঁকে ফেল। একটা অসাধারণ ন্যুড।

এভাবে কতজনকেই না খুঁচিয়েছি আমি, অন্য কিছু নয়, বিকশিত হওয়ার জন্য। স্বপ্ন দেখার জন্য। যারা যে-কোনো জায়গায় সে জীবনেই হোক অথবা রাজনীতিতে অথবা সাহিত্যে বিদ্রোহ করেছে, প্রচলিত প্রথা ভেঙেছে, তারাই আমার কাছে ছিল মূল্যবান। জীবন্ত। অবদমনের বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ ছাড়া আর কী করতে পারে। অথচ কাণ্ড দ্যাখো, এইসব বিদ্রোহগুলো ছিল তাৎক্ষণিক, বোধহীনের সাময়িক উল্লম্ফন মাত্র—এরা পর-মুহূর্তেই তাদের জড়-জীবনে ফিরে গেছে।

এদের মধ্যে আমি খুঁজেছি বস্তুত নিজেকেই। কে আর কিছু না-হওয়ার মধ্যে দিয়ে অন্য কিছু হতে চায়!

এরা আমার স্বপ্ন মাত্র।

বরং আক্ষরিক অর্থে যা স্বপ্ন তার কথাই বলা যাক।

এক : স্বপ্নের মধ্যে আমরা যেমন অচেনা লোকবসতির মধ্যে চলে যাই হঠাৎ করে, সেরকমই একটা জায়গায় গেছি। অচেনা কিন্তু অজানা নয় সবকিছু, সেই ছোটখাটো বাজার বা শহর, সেই গ্রাম আর লোকজন।

সারারাত চলার পর ওইরকমই একটা বাজারে এসে বাস থামে। সকাল। বাসটাও আর যাবে না, এখান থেকেই ফিরবে। নেমে পড়ি বাস থেকে। প্রচণ্ড খিদে। ঢুকে পড়ি একটা খাবারের দোকানে। সে দোকানের মালিক আবার এক মহিলা। রুটি তরকারি হাভাতের মতোই হু-হু করে গেলার সময় সহসা মনে হয় আমি কপর্দকশূন্য। স্বপ্নের মধ্যে কারুর পকেটেই পয়সা থাকে না। খাওয়া শেষ না করেই এক ফাঁকে পালাই।

এলোমেলো হাঁটতে থাকি গ্রাম-গঞ্জের পথ ধরে। সেই খাবারের দোকান থেকে অনেকটাই দূরে চলে এসেছি তবু টের পাই সেই দোকানি মহিলা, সেই মালকিন আমার পিছু নিয়েছে। তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই, সে আমাকে পাকড়াও করবেই।

হঠাৎ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি, খুলে ফেলি সব জামাকাপড়। পাগল হয়ে যাই, পাগল হয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি।

দোকানি মহিলাটি কাছে আসে, ঝুঁকে পড়ে আমার মুখ দ্যাখে, দ্যাখে ন্যাংটো আমাকে—দেখে ফিসফিস করে একা একাই, সেই লোকটির মতোই মনে হচ্ছে কিন্তু এ তো সেই লোক নয়। এ তো একটা পাগল।

দুই : বাড়ি থেকে চলে গেছি কতকাল আগে—যেন বা একজীবন অতিবাহিত করে ছোট্ট একটা শিশুকে নিয়ে ফিরলাম—পুরনো জীবনে। মনে হচ্ছিল মৃত্যুর পর ফিরে আসা।

বাচ্চাটি যে কে—তাও জানি না। ওর বাবা-মাকে জানি না। ওকে শুধু বয়ে এনেছি, অহেতুক অকারণে। আমি আমার পুরনো জায়গায় ফিরে এসে দেখি, পুরোটা বদলে গেছে। গ্রাম হয়ে উঠেছে কুৎসিত ঘিঞ্জি শহর। কোন্‌টা আমার ঘর খুঁজে বের করতে পারি না।

আন্দাজে একটা ঘরে ঢুকেই চমকে উঠি, এ তো আমার সেই পুরনো জীবনের ঘরের মতোই, সেই ছেঁড়া-খোড়া বই, সেই কুঁজো হয়ে থাকা ভাঙা আলমারি।

সে ঘরে এক যুবক সাদা কাগজ সামনে নিয়ে বসে আছে—নির্ঘাৎ কিছু লেখার চেষ্টা করছে—কিন্তু লিখে উঠতে পারছে না। চোখ তুলে আমাকে দেখে সে অবাক, আপনি অরুণেশ ঘোষ না?

হ্যাঁ।

আপনার লেখা পড়েই আমি লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আঙুল তুলে দেখায় সে, ওই যে আপনার ঘর। ওই দেখুন।

মুখ-থুবড়ে পড়া কোমরভাঙা একটা ঘর, সে ঘরের মেঝেতে বসে আমারই স্ত্রী ছেলে-

মেয়েরা খাচ্ছে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে হাঁ-হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর দ্যাখো, তাদের বয়স, চেহারা সবই সেই আগের জায়গাতেই থেমে আছে—যে সময়ে আমি তাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম। মজার ব্যাপার এই যে—এতে আমি একবিন্দু অবাকও হচ্ছি না।

তিন : সকালবেলার আলো এসে পড়েছে নতুন, এই দিন কয়েক আগে সাড়ম্বরে উদ্বোধন করা সদ্য নির্মিত এক ঝকঝকে কংক্রিটের দীর্ঘ ব্রিজের উপর। নীচে মৃতপ্রায় নদীর সামান্য থক্‌থকে করুণ জল ও বালির চড়া আর উপরে, ব্রিজের বুকের উপর দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে জাঙ্গাল-বাঁধা একপাল মোষকে। লম্বা দড়িতে সে সব মোষের একটার সঙ্গে আরেকটাকে এমনভাবে বাঁধা যে—কেউ কাউকে ছেড়ে পালাতে পারবে না।—কেউ একা ইচ্ছে মতন ছুটতে পারবে না। পেছনে দালালের ভাড়াটে রাখাল, তাদের হাতে চাবুক, চাবুকের মাথায় কাঁটা—। চাবুক চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা—আলপিন বিঁধে যায়। ওরা একসঙ্গে ছোটে। রাখালদের পেছনে একা একটি মোষের বাচ্চা। তার গলায় কোনো দড়ি নেই, সে ছেড়ে দেওয়া। সে আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মধ্যে, হাম্বা—। আর ছুট ছুটে চলছে সামনের দিকে—রাখালদের তার দিকে তেমন নজর নেই, সে যে আসবেই, তারা জানে। কারণটা আর কিছুই নয়, সামনে মোষের পালের মধ্যে রয়েছে তার মা, সে যাবে তার মায়ের টানেই।

এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে—যেমন কেউ কেউ স্বপ্ন দেখার সময় টের পায় সে স্বপ্ন দেখছে—সে ভাবেই আমি বুঝি, স্বপ্ন মুহূর্তে বদলে যাবে। বদলেও যায়, মোষের পাল হয়ে যায় একদল গলায় শেকল-বাঁধা ক্রীতদাসী, আর ওই বাচ্চা মোষটি একটি মানবশিশু। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হই অন্য কারণে, রশি-বিহীন-ইজের এক হাতে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতের উল্টোপিঠে নাকের শিক্‌নি-পোঁটা মুছতে মুছতে কালো কুচকুচে যে ছেলেটি ছুটছে তার শেকল- বদ্ধ ক্রীতদাসী মায়ের পেছন পেছন—সে তো অন্য কেউ নয়, সে আমি। আমার শৈশব।

সব স্বপ্নই দুঃস্বপ্ন, যদিও দুঃস্বপ্নে ভয় নেই আর। যে শুরু থেকে সাফল্য চায় না শুধু পৌঁছতে চায় নিঃশব্দে—ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে—দুঃস্বপ্ন তার স্বাভাবিক সঙ্গী। বস্তুত যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়—আর বাঁচা মৃত্যুর পরেও দেখে—হেসে উঠি।

স্বপ্নের বাইরে যে বাস্তবতা—সেখানেও ঘনঘোর দুর্যোগ, কী প্রাকৃতিক কী রাষ্ট্রীয়—প্রবল বর্ষণের মধ্যে সাবধান করা হচ্ছে—যে-কোনো মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে—ভেসে যেতে পারে ছোট্ট শহর। শহরে আবার কার্ফু—কী যে হাস্যকর—সন্ত্রাসবাদীরা নাকি শহরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে আর আমি এদিকে মধ্যরাতে খুলে বসেছি দান্তে।

দান্তে এখন কেউ পড়ে দান্তের নরক?!

আরও মজার ব্যাপার এখানেই যে, ঘটনাটা ঘটল তখনই, আমার ঘরে উদয় হলেন

এক বিপ্লবী—সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী যাই বলা হোক না কেন—আমি তাকে দেখে ভেতরে ভেতরে আনন্দে প্রায় নেচেই উঠলাম। তার হাতে একচিলতে চিরকুট। ভুলে যাওয়া পুরনো এক বন্ধুর আবেদন, এক রাত্রির জন্য থাকতে দিবি। সেই বন্ধুটিই তাহলে এখন বিপ্লবীদের সর্দার।

যা হোক, আমি ধন্য হয়ে গেলাম এমন একটা সুযোগ পেয়ে। উনিশ কি একুশ—এরকম বয়স, চৌকো মুখ, লালচে দাড়ি—কালো কাপড়ে মোড়ানো আগ্নেয়াস্ত্র তার কাঁধে।

তুমি আমার খাবার খাও। ইচ্ছে করলে খানিকটা পানীয়ও নিতে পারো। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো আমার বিছানায়। আমি-ই বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।—এসব বলার পর আস্তে করে তাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা তোমার নাম কী? নামটা তো জানা হয়নি।

আমার নাম?—সে মুখ তুলে তাকায়, আমার নাম অরুণেশ ঘোষ।

সে কী করে হয়? কী বলছো তুমি?

দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলে, মিথ্যে বলছি না। আমি-ই...

১৯৯৯

ভাষার মুক্তি, ভাষার কারাগার

......

ভাষাকে শুধু জীবন্ত হলেই চলবে না তাকে মুক্ত হতে হবে। ভাষাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে! ভাষাকে শুধু তীব্র তীক্ষ্ণ ও একমুখী করে তুললেই চলবে না, তাকে নিয়ে আসতে হবে জীবনের কাছাকাছি, জীবনের প্রবাহের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে হবে। ভাষাকে শুধু স্মার্ট বা চিত্রবহুল, সংযত বা বিশৃঙ্খল করলে কিছু পাব না আমরা, যদি পরিত্যাগ করতে না পারি গোঁড়ামি ও ক্ষীণ দৃষ্টি, অর্জন করতে না পারি সমগ্রতার বোধ ও মুক্তদৃষ্টি। ভাষা যে আজ জীবনের সমগ্রতাকে, সৌন্দর্যের সমগ্র রূপকে ধরতে পারছে না, সে দায় আমাদেরই, জীবন এগিয়ে গেছে, ভাষা এগিয়ে যায়নি অর্থাৎ ভাষাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি।

যুক্তি, বুদ্ধি ও দক্ষতা ভাষাকে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করে তুলতে চায়। এরা চায় ভাষার শৃঙ্খলা। যদি ভাষার শৃঙ্খলা আনা যায়, একধরনের উজ্জ্বলতা ভাষা শরীরে দেখতে পাব ঠিকই, কিন্তু সেই উজ্জ্বলতা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সিগারেট বাক্সের রাংতার মতোই, যা মানুষের কোনো কাজে লাগে না। যা আমাদের জীবনের গভীরে নিয়ে যেতে পারে না। কৃত্রিমতার স্পর্শে সবকিছুকে কৃত্রিম করে তুলতে চায়, কৃত্রিমতার কারবারিরা এভাবেই তাদের চিন্তাকে আর চিন্তার প্রকাশকে যথাযথ, প্রায় আবেগহীন ও একটা নিয়মে বেঁধে দিতে চায়। ভাষা দিয়ে আমরা যে বিশালতাকে, যে আ-অসীম জন্ম-যোনি-সমুদ্র-নিসর্গ-মৃত্যু-প্রেম-গতি ও মানুষের বিবর্তন পরম্পরাকে ধরতে চাই, এক জীবন থেকে অন্য জীবনে, এক জীবন থেকে বহু জীবনে চলে যেতে চাই, সেই আকাঙ্ক্ষার একটি রোমও এই পথে স্পর্শ করা যাবে না। মানুষ হতাশ হয়েই লক্ষ্যে পৌঁছবার গতিতে পরিত্যাগ করে আর নিজেকে বোঝায়, মুক্তি অবাস্তব, মুক্তি পেতে হলে ভাষাকে শব্দকে আর এমনকী সমস্ত অক্ষর পরিকল্পনাকে বর্জন করতে হবে। চলে যেতে হবে শূন্যে—নীরবতায় নিঃশব্দতার কারণ ভাষার শুরুটা নাকি কৃত্রিমতা থেকেই রয়েছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে।

আর ঠিক এর উল্টোদিকেই রয়েছে ভাষাকে বিশৃঙ্খল বা ধোঁয়াটে করে তোলা, তাকে আবেগসর্বস্ব বা ভারাক্রান্ত করে শুধু নিজের অহংকে পরিতৃপ্ত করার জন্য কাজে লাগানো। ভাষা বিপ্লব আমাদের কাম্য, কিন্তু ভাষার নৈরাজ্য হাস্যকর ও অর্থহীন। রক্ষণশীলরা যুক্তি দিয়ে ভাষাকে বাঁধতে চায়, গতিকে তারা ভয় পায় বলেই তাদের চাই সেই মনোমতো

রুদ্ধভাষা। নৈরাশ্যবাদীরা উল্টোদিক থেকে একই রকমভাবে ভাষাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিয়ে আসতে চায় আরেক কৃত্রিমতা। দু-পক্ষই ভয় পায় গতি ও সৃষ্টিকে। বুদ্ধি ভাষাকে পরিচালিত করুক, আমরা তা চাইনি, চেয়েছি হৃদয়ের ভাষা। আর গল্পের সেই কল্পতরুর মতোই চাওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল চিৎকার, আর্তনাদ, আত্মবিলাপ গর্জন ও উল্লাস! না-বাদীরা সব বাক্যের শেষে একটা করে না বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় ভাষার বাইরে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে তারা, যারা এই ভাষার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, ঝুলে আছে। ভাবে, ভাষা বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে। হেসে উঠতে হয় আমাদের, ভাষা ধ্বংস হয় না—প্রসারিত হয় মাত্র, সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনায় সে-ও কত সামান্য। ভাষার মধ্যে শক্তি লুকিয়ে থাকে, ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে—যে শক্তি ভাষাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ভাষাকে স্বচ্ছ ও আবর্জনা মুক্ত করতে আমরা হৃদয় থেকে বুদ্ধিতে ফিরতে পারি না কোনো মতেই, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টার পরিবর্তে তার গতিমুখের সব বাধাগুলি সরিয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে আমাদের স্বপ্নের ভাষার দিকে। আসলে ভাষার আমূল পরিবর্তন, সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া...আমাদের স্বপ্নের সেই ভাষা বিপ্লব বাস্তবে সংঘটিত হয় না। বিপ্লবের সূচনা হওয়ামাত্র প্রতি বিপ্লবের ভ্রূণগুলি পাশাপাশি হতেই গর্ভে দানা বাঁধতে থাকে, ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায়, সংঘর্ষে দ্বন্দ্বে যেটা ঘটে সে হল বিবর্তন। ভাষা এই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

জীবনানন্দ ও কমলকুমার যাঁদের ভাষার শরীর জুড়ে ছবির পর ছবি, শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা, এদিক দিয়ে দুজনকে মনে হবে প্রতিবেশী। রূপকে রূপান্তরিত করে ভাষার মধ্যে এনে আবার তাকে ছবি করে তোলা, চিত্র পরম্পরতায় চলে যাওয়া এক অসীমের দিকে, এই শক্তির উৎস হৃদয়। নিছক বুদ্ধি কোনো ছবি আঁকতে পারে না। কমলকুমারকে এখনও দুরূহ লেখক বলা হয়, একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে তাঁরও উদ্দেশ্য হৃদয়-উন্মোচন। কিন্তু বাংলা ভাষা বলতে আমরা যে ভাষাকে বুঝি যে ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য সাহিত্যের উপযোগী করে রেখে গেছেন, সেই ভাষাকে কমলকুমার সম্পূর্ণই অস্বীকার করে যেতে পেরেছেন। কমলকুমারের ভাষা বিদ্যাসাগরের সময়ের ভাষা নয়, নয় কোনো অঞ্চলের বা কোনো উপজাতি গোষ্ঠীর লোকভাষা, ফরাসি ভাষার প্রেরণাতেই শুধুমাত্র তাঁর ভাষা গড়ে ওঠেনি, অবশ্য এ সবই তাঁর ভাষায়—ভাষার আত্মায় নিঃশব্দই রয়ে গেছে। কমলকুমারের ভাষা আমাদের এই ভাষার বিপরীত, যে ভাষার জন্ম ইংরেজদের আসার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনায়—মুহূর্তে যে ভাষা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই মাটি থেকে। জীবন—বাঙালি জীবন আর মূল রয়ে গেছে আরও পেছনে আরও দূরে—কমলকুমার চলে যেতে চেয়েছেন সেই উৎসে। তিনি ধরতে চেয়েছেন আমাদের ভাষার সমগ্রতাকে। আরও একজন, জীবনানন্দ যিনি অস্বীকার করেছিলেন এই ভাষা কাঠামোকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাষার জন্য—এক নতুন ও সৃষ্টি-উন্মুখ ভাষার জন্য যেতে হয়েছিল

সরাসরি জীবনের কাছে, জীবন ও নিসর্গের কাছে। ভাবি, কেন হঠাৎ বন্ধ্যা হয়ে উঠল এই 'আধুনিক বাংলা ভাষা'—? কারণ, তা কি ছিল শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের ব্যবহারের জন্য মধ্যবিত্তের সৃষ্ট ভাষা? বাঙালি মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাও কি গড়ে উঠেছে? ওই ভাষার শেষতম কবি ও গদ্য লেখক যারা, তারাও এর মধ্যেই আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। কী পরিহাস! আজ যখন জীবনানন্দ ও কমলকুমার পড়ি, বুঝতে পারি এই দুজনই এই শতাব্দী জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তবু আমাদের আত্মা রয়ে যায় অতৃপ্ত—আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই, এমন এক ভাষা চাই যার স্পষ্ট রূপ কী হবে তা ঠিক জানি না, শুধু কল্পনায়, হৃদয় আর বিরতিহীন সমুদ্রে গর্জন শুনে যেতে থাকি, সেই না পাওয়া ভাষার আলোড়ন। ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে তার সন্ধানে।

চিত্রকল্প, প্রতীক ও রূপক ভাষাকে মুক্তি দিতে পারেনি। কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। আজও যে আমরা ওই চিত্রকল্প বা প্রতীক রূপক যা উপমার সাহায্য নিই, সে আমাদের অনেকটা অজান্তেই ভাষায় যা প্রকাশ পায়, তা কত সামান্য—আহ্, কী ক্ষুদ্র—কী অণুমাত্র। যার সম্পূর্ণ আবার আমাদের হৃদয়ের বিশালতার নীচে এখনও অজ্ঞাত। সেই বিশালতার সামান্য অংশ মাত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেন সম্পূর্ণতার সামান্য বা অসামান্য আভাস আসে ভাষায়, সে জন্যেই বিরামহীন পথ খোঁজা। প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্প সে জন্যেই এসে গেছে আজ আবার মনে হচ্ছে। এসবই ভাষার শেকল, ভাষাকে বন্দি করে রাখছে। কমলকুমার ধ্রুপদি ভাষার সঙ্গে লোকায়ত ভাষাকে মিশিয়ে আনতে চেয়েছেন সেই ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তি সেই মুক্তির আস্বাদ—যা প্রায় প্রতি বাঁকে তিনি ধরতে চেয়েছেন। যখন ওই ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয় হঠাৎই উপলব্ধি করি, স্পষ্ট দেখতে পাই, ভাষা কারুর একার সৃষ্টি নয়। ভাষার মূল রয়ে গেছে সম্মিলিত মানুষের রহস্যময় চেতনায়। কমলকুমার ছিলেন ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসী। জীবনানন্দের ছিল সংশয়, তাঁর ভাষার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল শরীর, সত্তা ও প্রকৃতি চেতনা। যে প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আর মৃত্যু, অবলুপ্তি ও রহস্যের প্রতি তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ। যা তাঁকে তাঁর সংশয়ের ভাষার পরিধি ছিঁড়ে আরও দূরের অন্য এক ভাষার দিকে নিয়ে যেতে চায়। আসলে তাঁর ভাষায় এসে পড়ে একই সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলো। আধ্যাত্মিক অনুভূতি...। ঐশী শক্তি। আমরা বিশ্বাস করতে চাই না আর। অদ্ভুত এই যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সংশয় ও বিদ্রোহ, ঐশী চেতনা ও বস্তু চেতনা—ভাষাকে ভেতর থেকে পরিচালিত করে এককেটি সভ্যতায়, সময়ে ও সন্ধিক্ষণে। একের সঙ্গে অন্যের যে সংঘর্ষ চলছে, তারও ছায়া এসে পড়ে ভাষায়। আর প্রবল সক্রিয়তা ভাষাকে একটা রূপ দেয়, নিষ্ক্রিয়তা আরেক রূপ। সক্রিয়তা ভাষাকে কি অবেশেষে পৌঁছে দিতে চায় যান্ত্রিকতায়? আর নিষ্ক্রিয়তা ভাষাকে করে তুলতে চায় জড়?

ইউরোপ ও আমেরিকায় ঠিক এই সময়ে এমন কিছু লেখা হচ্ছে, কবিতা বা গদ্য, যা পড়ে ক্লান্ত পাঠক সম্ভবত খানিকটা স্বস্তি পায়। পাঠক, আসুন, তাকাই এই কবিতাটির দিকে,

ধীরে ধীরে মোজা খুলতে খুলতে বলল মেয়েটি
হ্যাঁ
স্বর্গে যেতে হলে দশ ডলার মাত্র লাগে
কিন্তু আমার কাছে তো দশ ডলার নেই
বলল লোকটি
মিষ্টি হেসে বলল মেয়েটি
তাহলে নরকে যাও।

[চার্লস্ বাকোস্কি]

'বাহ্'— পাঠক আপনার অজান্তেই আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এর পরেই আপনাকে চলে যেতে হবে পেচ্ছাপখানায়, পেচ্ছাপ সেরে এসে আবার হঠাৎ যদি কবিতাটির দিকে চোখ পড়ে, তবে দেখবেন, গোটা ইউরোপ আমেরিকার আরেনেসাঁস যে সক্রিয়তার কথা আমরা জানি, ভাষাকে— কবিতার ভাষায়, ছবির ভাষায় ও গদ্যের ভাষায় যে বিপ্লব পরিবর্তন একের পর এক স্রষ্টারা আনতে চেয়েছেন, এ যেন তারই শেষ পরিণাম ও পরিণতি। উপসংহার কী? ভাষা এখানে যান্ত্রিক, স্মার্ট ও কৃত্রিম। এ যেন মুক্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে কাফকার সেই অদ্ভুত ও প্রতিকী মেশিনটিতে মৃত্যু বেছে নেওয়া। ঠিক এই ভাষাতেই ওইসব দেশে এখন তথাকথিত প্রতিবাদের কবিতা বা সাহিত্য করা হয়। এ যেন বড় যন্ত্রের চাপের বিরুদ্ধে ছোট যন্ত্রের গুমরে ওঠা। সত্যি, আজ গোটা ইউরোপকে নিঃশব্দে যুদ্ধ করতে হচ্ছে আবার এক জীবনের ভাষার জন্য, জীবন্ত ভাষার জন্য। তার চিন্তা চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে আনতে চায় আবার মানুষ, যে মানুষ এর মধ্যেই সেখান থেকে বিতাড়িত। সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে এক উদ্ভট, এই যন্ত্রসভ্যতা। যা তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তার ভাষাকেও কৃত্রিম করে তুলবে, স্বাভাবিকভাবেই।

আমাদের অবস্থাটা কিছুটা ভিন্ন রকম, আমরা বোধের উন্মেষের পর যে ভাষার কাছে আসি তা প্রায় জড় ভাষা। কারণ আমাদের ভাষা মূলত মধ্যবিত্ত ভাষা। যদি কেউ আমাদের, বাঙালি মধ্যবিত্তের শিশুদের কণ্ঠস্বরের দিকে কান পাতে, তাকে আতঙ্কে অস্থির হতে হবে। তার শ্রেণীর ভাষার মতোই তার গলার স্বরটিও হয়ে উঠেছে কী বীভৎসভাবেই না কৃত্রিম। এটা ঠিক যে বাঙালি মধ্যবিত্তরা এসেছে, পুব পশ্চিমবাংলার নানান অঞ্চল থেকে, কিন্তু তারা আঞ্চলিক ভাষার শেষ টানটুকুও হারিয়ে ফেলেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত বা

অধঃপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এর জন্য দুই বা তিনটি জেনারেশনের প্রয়োজন হয়নি, এক জেনারেশনেই এটা ঘটে গেছে। আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলি, তার সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা নিয়ে এখনও জীবন্ত কিন্তু সেই ভাষায় কোনো সাহিত্য সৃষ্টি এখন আর হয় না, সম্ভবও নয়। তা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত ওই ভাড়াটে ভাষায়। এই তৈরি করা ভাষার সঙ্গে এসে মিশে যাচ্ছে পশ্চিমের যান্ত্রিকতা, অনেকটা আমাদের অজান্তেই। আমরা, যেমন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন, অনুসরণ করেছিলেন অনেকখানি সে রকম এখনও সেখান থেকেই প্রেরণা পাই। এই সভ্যতাকে ধ্বংস করার প্রেরণা বা তাকে টিকিয়ে রাখার প্রেরণা, একই উৎস থেকে আসে। আর এই বিদ্রোহ বিপ্লব বা প্রতিবাদ...সব ধারণাগুলিই আমরা পেয়েছি সেখান থেকেই। গিনস্‌বার্গের কবিতা আমাদের আলোড়িত করে, প্রেরণা জোগায় এই জন্যে যে, তা আমেরিকার যন্ত্রজঙ্গলকে অস্বীকার করে মানবিক সৃষ্টি এবং যারা ছিটকে পড়েছে বাইরে তাদের এক সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রকাশ। কিন্তু যখন দেখি অবশেষে গিনস্‌বার্গ ধর্মে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন বা আধ্যাত্মিকতায় নতুন জীবন খুঁজে পাচ্ছেন—ছুটে পালিয়ে আসতে হয় আমাদের। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আসলে গোটা ইউরোপীয় চেতনার সঙ্গে আমাদের এমন একটা তফাত ঘটে গেছে, যা হয়তো আর কোনোদিনই মেলানো যাবে না।

তাহলে কি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, নতুন এক ভাষার জন্য? অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে? যতক্ষণ না এই শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটছে? সত্যি, মধ্যবিত্তের এই অসাড় ভাষা দিয়ে আর সৃষ্টি সম্ভবই নয়, যে-কোনো একজন তরুণ কবি ও লেখক এই ভাষার সামনে এসে থমকে দাঁড়াবে, কীভাবে সে এই কারাগার ভাঙবে, ভাবে। সে অসহায় বোধ করে হয়তো এলোপাথাড়ি কিছু আঘাত করে, তারপর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে একদিন,হতাশা এসে তাকে গ্রাস করে, সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায় এই বলে যে, এই বিশাল অসাড়তাকে—জগদ্দলকে তার একার পক্ষে সম্ভব নয় অপসারিত করা। সে মুছে যায়। কিন্তু এর মধ্যেই যে সৃষ্টি সম্ভব, সম্ভব এদের ব্যবহৃত শব্দগুলি ব্যবহার করেও নতুন এক ভাষার দিকে যাওয়া—তার দৃষ্টান্ত জীবনানন্দ ও কমলকুমার। জীবন থেকে তুলে নিতে হবে সেই শক্তি, যা এই ভাষার মধ্যে থেকেও নতুন ভাষার সৃষ্টিতে উন্মাদ হয়ে ওঠে। শক্তি ছড়ানো রয়েছে জীবনের সর্বত্র, শুধু তা তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। এ জন্যেই প্রয়োজন সাহস। ভাষা আকাশ থেকে নেমে আসে না, সে থাকে এখানেই, কোথায় সে জীবন্ত আর কোথায় সে মৃত। কেউ কেউ, এই পৃথিবীতে এসেই কয়েক মুহূর্তেই তা টের পেয়ে যায়...

পৃথিবীতে এমন দিন কখনোই আসবে না, যখন ভাষা থাকবে কিন্তু মানুষ থাকবে না। অথবা রয়ে যাবে এক নিঃশব্দ ও মূক মানবসমাজ, তাদের ভাষা মিলিয়ে যাবে বিবর্তনের শেষ ধাপে এসে। তাকে আবার খুঁজে নিতে হবে আদিম আওয়াজ। এই কল্পনা আমাদের শিহরিত করতে পারে মাত্র, কিন্তু সত্য তা নয়। ভাষাকে নির্মাণ করা হয়নি, ভাষা মানুষের

চেতনা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে অনেকটা তার অজ্ঞাতে তার অস্পষ্ট অথচ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ ও কলোচ্ছাসময় অভ্যন্তরের এক নীহারিকা স্রোত থেকে। আমি শুনি সেই মানুষের আদিম আওয়াজ—শিশুর প্রতি মায়ের এক দুর্বোধ্য হাম্বা রব। মানুষের প্রতি মানুষের পশুর করুণ চোখ তুলে তাকিয়ে থাকা, এখনও এই ভাষার মধ্যে শব্দের মধ্যে ও অক্ষরের গভীর গহ্বরে সেই অতৃপ্তি, অতৃপ্তির বেদনা, যন্ত্রণা, আকুলতা ও উন্মাদনা—যা থেকে শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান, বহমান বলেই ভাষা সজীব ও গতিশীল। আমরা সেই পরম ভাষা—ভাষার সম্পূর্ণ মুক্তি হয়তো কোনোদিনই পাব না, কিন্তু সেই মুক্ত ভাষার দিকেই আমাদের যাত্রা...।

১৯৭১

গ্রন্থ ও মানুষ

......

না, আমি আমার জীবন শুধুমাত্র গ্রন্থের মধ্যে শুরু করিনি। আমি আমার জীবন শুরু করেছি গ্রন্থ ও মানুষের মধ্যে। মানুষের দিকে ছুটে গেছি তীব্র কৌতূহল নিয়ে। আমি তাকে পড়তে চাই। আমি তার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা অব্দি পড়ে যাব। কিন্তু সে শামুকের মতো গুটিয়ে নেয় নিজেকে। আমাকে দেখে, আমার চোখের দৃষ্টি—আমার দৃষ্টির চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখে সে তার মলাট বন্ধ করে ফেলে ভয়ে। আমি লুকিয়ে থাকি, গোপনে, তার অজান্তে তাকে দেখি। দেখামাত্র আদ্যপান্ত পড়া হয়ে যায় আমার। বুঝতে পারি, বেশির ভাগ মানুষের ভেতরের পাতাগুলি সাদা। সেখানে কোনো কালির দাগ পড়েনি। বেশির ভাগ মানুষ নিরেট, তাদের কোনো জীবন নেই। সেই ছেলেবেলাতেই বুঝে যাই, বেশির ভাগ মানুষ মৃত, অপাঠ্য আর আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। এরা সমাজের ঘূর্ণ্যমান চাকার একেকটি খাঁজকাটা দাঁত মাত্র। যারা চাকার সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছায়—স্বেচ্ছায় ঘুরে যাচ্ছে আর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমি ফিরে আসি গ্রন্থের কাছে। বই, বই, বই—বিশাল এক জগৎ। এক ব্রহ্মাণ্ড। ছোট্ট ও অপরিসর গ্রহের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে হাজারটা ব্রহ্মাণ্ড। বই আমাকে পাগল করে। কিন্তু, না, সব বই নয়। গ্রন্থও অধিকাংশ মৃত, যেমন মানুষ। গ্রন্থ ও অধিকাংশ মৃত মানুষের জন্য মৃত মানুষদের দ্বারা লেখা। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ, ভণ্ডদের ভণ্ডামিতে। নির্যাতনকারীদের দালালদের দিয়ে লেখা গ্রন্থের পর গ্রন্থ। মানুষকে আরও হাজার বছর ধরে বন্দি করে রাখার এক শব্দের জেলখানা। এই বন্দিশালা প্রকৃত কারাগারের চেয়েও ভয়াবহ কারণ এখানে কয়েদিরা ছোট ছোট পরিবারে ছড়িয়ে আছে, তারা যৌনসঙ্গম করে, সন্তানের জন্ম দেয়, আর মৃত্যু হয় এখানেই মুখ গুঁজে। অদ্ভুত এক বিশ্বাস নিয়ে। সত্যি অনেক গ্রন্থের পৃষ্ঠাই সাদা, কোনো কালির আঁচড় পড়েনি সেখানে। কত বই অপাঠ্য, হাস্যকর ও অর্থহীন। কিন্তু চূড়ান্তভাবে নগ্ন, যা চূড়ান্তভাবে অপাঠ্য, হাস্যকর ও অর্থহীন, সেইসব গ্রন্থের গর্ভে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। না, তা নয় ওইসব বই নির্বোধভাবে লেখা। মুখোশ পরা একটি মুখ ঝুঁকে আছে টেবিলে, একটি দস্তানা পরা কাটা হাত লিখে চলেছে রোবটের ভাষায়, যান্ত্রিক চিন্তার পরম্পরা ধরে এগিয়ে চলেছে তার কলম। তবু, হঠাৎ কখন মুখোশের তলার মুখ, দস্তানার নীচে মাংসের আঙুল তিরতির করে কেঁপে ওঠে। ওই মুখোশধারীর জন্য কোনো করুণা নেই আমার। কোনো করুণা নেই মৃত মানুষ ও মৃত গ্রন্থের জন্য।

কত কম বয়সেই আমি পেয়ে যাই একজন জীবিত মানুষকে। কত কম বয়েসেই পেয়ে

যাই একটি জীবিত গ্রন্থকে। এ আমার সৌভাগ্য কি? না, এ আমার 'দুর্ভাগ্য'। এমন এক মহৎ দুর্ভাগ্য, যার জন্য বুদ্ধকে জন্ম নিতে হয় বার বার, সেই মহান দুর্ভাগ্যে পৌঁছতে। নিষিদ্ধ পৃথিবী আমার সামনে উন্মোচিত। আমার সামনে খোলা গ্রন্থ, হা-খোলা মানুষ, আমি তাদের মধ্যে দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলি...কিন্তু একটি জীবিত মানুষের কাছে পৌঁছতে গেলে পেরুতে হয় হাজার হাজার মৃতের স্তূপ। একটি জীবিত গ্রন্থের কাছে পৌঁছতে গেলে অতিক্রম করতে হয় মৃত গ্রন্থের পাহাড়। আমি দেখি, মানুষের মধ্যে যারা জীবিত, তারা হতভাগ্য, পতিত ও নির্যাতিত। তারা দলছুট, উন্মাদ ও সত্যভ্রষ্ট। তারা অসামাজিক, উচ্ছল, নীতি ও আদর্শহীন। চারপাশের 'না'-এর মধ্যে তারা এক একটি প্রস্ফুটিত 'হ্যাঁ'। অসংখ্য কালো ঢেউ ছুটে আসে তাকে গুঁড়িয়ে দিতে। তারা লুকিয়ে থাকে এদের মধ্যেই, ছোট আবার ছোট জীবন আর এক স্বাভাবিক অভিনয় নিয়ে নিয়ে এক বড় মানুষ। বড় মানুষের ভ্রূণ। জীবন্ত গ্রন্থ, জীবিত মানুষদের মতোই রহস্যময়। জীবন্ত গ্রন্থের ভাষা অমার্জিত, অস্থির ও অক্ষম। মনে হবে চারপাশের চমকপ্রদ, বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ ও যথাসাধ্য নির্মাণের মধ্যে এ এক বর্বরতা। মূর্তিমান জীবন। যাকে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চায় সমাজ, পরে যখন এড়াতে না পারে, তাকে বিকৃত করতে শুরু করে। জীবন্ত, বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ। যা একমাত্র জীবিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব জীবনের ভয়ংকর প্রদেশগুলিতে পা রাখা, একবার যখন আমি এই বইগুলি পেয়ে যাই, তখন অন্যগুলিকে ছুঁড়ে দিতে পারি সময়ের জীবের বিশাল হা-গহ্বরে। একবার যখন সেইসব মানুষদের পেয়ে যাই, অন্যদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই হাসতে হাসতে।

আহ্ এ যদি হত কোনো আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা! উল্লসিত হওয়ার মতন কিছু। প্রথমেই তা নয়। প্রথমেই নির্যাতন। জীবনের শুরু নির্যাতন দিয়ে। ঘৃণা দিয়ে। হিংস্রতা দিয়ে। কে আমার ওপর প্রথম নির্যাতন শুরু করে? নিঃসন্দেহে আমার মা। হ্যাঁ, আমার জননী, যার গর্ভ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েই চোখ তুলে তাকিয়েছি তার দিকে। আমার প্রথম কৌতূহল তো তার সম্পর্কেই। আমি প্রথমেই যে গ্রন্থের যে মলাট ওল্টাতে হাত বাড়িয়েছি, সে তো আমার মা-ই, সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু করে দেয় পাল্টা আঘাত। যাতে আমি তাকে পড়ে উঠতে না পারি। তার জীবনের সত্যগুলিকে জানতে না পারি। তার রহস্যভেদ করতে না পারি। 'মা' শব্দটির প্রতি দুর্বলতার, 'মা' শব্দটির প্রতি ঘৃণার শুরু এখান থেকেই। শুধু এক চাকা, থামতে-না-জানা সেই চাকা স্পর্শ করে যাচ্ছে একে একে মুখগহ্বর, পাকস্থলী ও যৌনাঙ্গ। ঈশ্বর এসে সেই আঁতুড়েই যে লিপি লিখে যায় কপালে, তা মাত্র এই কয়টি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 'এতেই সন্তুষ্ট থাকো।' 'এতেই'? 'হ্যাঁ'। 'হাঃ হাঃ'। সন্তুষ্ট থাকো আহার নিদ্রা মৈথুনে। কিন্তু ঈশ্বরী আমাদের প্ররোচিত করে। খ্রিস্টানদের যেমন করেছিল শয়তান। ঘুমে আমরা স্বপ্ন দেখি। প্রবল হ্যাঁচকা টানে বের করে আনতে চাই সমস্ত যৌন রহস্য। খাবারের কণাগুলির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাই। আমার মা, খুবই সাধারণ এক রমণী। তার নির্বুদ্ধিতা, ঈর্ষা ও মিথ্যাচারণ ও অন্যসব রমণীদের মতো স্বাভাবিক। সে কি

মৃত, অন্য সবায়ের মতো? তার দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করেছি নিজেকে? না, সম্পূর্ণ মৃত নয় সে, নয় সম্পূর্ণ জড়। সে-ও এক অসহায় বন্দি, হতভাগ্য, কয়েদি। কিন্তু সে তার প্রকৃত অবস্থা জানে না। সে আঘাত করে তার স্বামীকে, সন্তানকে। অক্ষম ভাবে। তার অভিযোগ ক্ষোভ ও দোষারোপগুলি জ্বলন্ত, সে চাইত অর্থ, সুখ আর কাজ। এমন সব কাজ, যে 'কাজ' মানুষকে অন্যসব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। পরিবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় এক নরকে। সে একে মেনে নিতে পারত না। আমি হাসতাম। সাদামাটা তার জীবন কিন্তু কোথাও সামান্য রহস্য রয়ে গেছে। প্রায় সব পৃষ্ঠাই সাদা, শুধু দু-একটি পৃষ্ঠা, যা জীবনের মাঝামাঝির, ভেতরের ও অভ্যন্তরের পৃষ্ঠা, সেখানে কিছু দুর্বোধ্য লিপি। আমাকে কাঁপিয়ে দেয়, আকর্ষণ করে আর আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। এই যথেষ্ট, আমি ভাবি, এ তো আমি আশা করিনি। একদিন উদ্ধার করি সেই রহস্যময় লিপি। আর হেসে উঠি, ওহ্, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তাকে আর ঘৃণা করি না, দায়ী করি না ও দোষ দিই না। তাকে আর ভালোও বাসি না, কোনো যৌন উন্মাদনা নেই তার প্রতি আর, নেই চোখ মেলে চেয়ে দেখবার মতো কিছু। আমি তাকাই বাইরের দিকে।

...আমার লোভ ছিল মা'র ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখা বইগুলির দিকে। যা আমার কাছে নিষিদ্ধ। প্রচণ্ড ক্ষুধা আমার। আমাকে ভয় পায় সবাই। আমাকে পড়তেই হবে ওইসব বই, যা মা তার বিয়েতে উপহার পেয়েছে। একদিন ট্রাঙ্ক থেকে বের করি সে সব , হাস্যকর। একটিমাত্র বই আমি বেছে নিই, দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখকের নাম আমি কতবার যে শুনেছি মা মাসি কাকাদের কাছে। গোগ্রাসে গিলতে থাকি। কাঁপতে কাঁপতে পড়তে থাকি। কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ে সেই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, যার কাছে তখনই ধরা দিতে শুরু করেছে জীবনের সত্য, মিথ্যা ও ভণ্ডামি। ওই আবেগ, ওই প্রেম আর গ্রন্থের চরিত্রগুলি আমার কাছে মনে হয় অর্থহীন। পড়তে পড়তে নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠি, না, না জীবন এরকম নয়। এ মিথ্যা, মিথ্যা। আমি মাতাল হয়ে উঠতে পারি না। শরৎচন্দ্র, সেই আমার শুরু ও শেষ। জন্মান্ধ পাঠকদের জন্য লেখা, জন্মান্ধ লেখকের। এ লেখা জীবনকে উন্মোচিত করে না। মনে আছে, আমার এক কাকা যখন গলায় কৃত্রিম আবেগ ঢেলে দিয়ে পড়ে শোনাচ্ছিল 'রামের সুমতি', পড়ছিল আর বুঝিয়ে দিচ্ছিল তা বৌদিদের। হো হো করে হেসে উঠেছিলাম আমি। কী আছে ওই বইতে? রামের গতানুগতিক বদমাইসি আর তার বৌদির জন্য স্নেহ, মমতা ও ন্যাকামি। শরৎচন্দ্রের মানবিকতা, আমার কাছে শুধু হাস্যকরই মনে হয়েছে। জীবনের প্যাঁচে প্যাঁচে গলিত ও অবলুপ্ত মূল্যবোধগুলি নিয়ে ছিল তাঁর কারবার। এ যেন মৃতদেহের মধ্যে আবেগ সঞ্চার। যদিও সেই বয়সে ওই পরিহাসের জন্য আমাকে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। যে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাঙালি সমাজ পাগল, তাকেই এগারো বছরের এক ছোকরার আঘাত! শুরু হয়ে যায় নির্যাতন।...

কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়েছি ততক্ষণে অন্য আরেকজনের দিকে। আমাদেরই এক আত্মীয়, ছড়িয়ে পড়া এই যৌনজালের মধ্যে আটকা পড়া আরও একজন। অবশ্য সে ছিল সবার

কাছে এক ভীতিকর বিভীষিকা ও দুঃস্বপ্ন বিশেষ। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই চুপ হয়ে যেত, সরে যেত। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে যেত মা। কিন্তু তার কাছে যেত না, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলত তার সঙ্গে, যেন এক কুষ্ঠরোগী। সে ছিল একজন শিল্পী, যাত্রাদলের অভিনেতা, গোটা জীবনকে সে সেইখানেই ছুঁড়ে দিয়েছে। গানে ও অভিনয়ে। সে ছিল মদ্যপ, সমকামী ও বেশ্যাসক্ত। সে কীভাবে তার সম্পত্তি, টাকা ও স্ত্রীর অলংকার ধ্বংস করেছে তার গল্প মেয়েদের মুখে মুখে ঘুরত। নতুন বউকে একা ঘরে ফেলে রেখে সে নাকি পাশের ঘরে যাত্রাদলের ছেলে নিয়ে শুয়ে থাকত। এই গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত মেয়েরা। এ এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। যেদিন সে আসত আমাদের বাড়িতে, সঙ্গে থাকত একটি কিশোর—চৌদ্দ কী ষোলোর। সুন্দর চেহারার, লাজুক স্বভাবের আর তার চোখ দুটো থাকত লালচে। ফুলো ফুলো গাল সেই কিশোরের দিকেও আমি তাকিয়ে থাকতাম। মেয়েরা একটু আড়ালে সরে গিয়ে ঠোঁট ওল্টাত, 'এবার নতুন আরেকটাকে এনেছেরে...' তাদের চোখে মুখে ঘেন্না মেশানো হাসি। কিন্তু যাকে নিয়ে এই তোলপাড় সেই পতিত মানুষটি কিন্তু সম্পূর্ণই নির্বিকার, নির্লজ্জ ও হাস্যময়। সে আপনমনে তার জগতে ভ্রাম্যমাণ। নিচু স্বরে কথা বলে চলেছে সঙ্গের ছেলেটির সঙ্গে। আমার সেই দূর সম্পর্কের মামা, যার কাছে আমি আশা করতাম প্রচণ্ড ঘেন্না ও অবজ্ঞা। আশা করতাম, সে থুতু ছিটিয়ে দিক্ তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমস্ত মানুষের দিকে, যারা তাকে কুষ্ঠরোগীর মতো দূরে সরিয়ে রাখে। যারা তাকে ভয় পায় আর তার নামে কুৎসা রটায়। আমি তার সমকাম সম্পর্কে কল্পনা করতাম। না, সে শুধু সমকামীই ছিল না। তার এক পাশে নগ্ন কিশোর আরেক পাশে নগ্ন স্ত্রীলোক মাঝখানে নগ্ন সে। আমি আমার দিব্যচোখে দেখতাম, আনন্দে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে দুজনকে। এক শক্তি তাকে চালিত করেছে। এক কালো স্রোত, সেইসব মানুষদের মাথার ওপর নৃত্যরত, কিন্তু ঘৃণায় ফেটে পড়ছে না। হাসছে সবার দিকে তাকিয়ে। হাসতে হাসতে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে পরিপূর্ণ ধ্বংসের দিকে। তার স্ত্রী ও সন্তানদের নির্মম দারিদ্র গল্পকথা হয়ে মুখে মুখে ফেরে। ওদের আঙুল তুলে দেখায় ছোট মানুষ, 'ওই দ্যাখো পরিণাম...খবরদার...।' এক ভোরবেলায় বেশ্যাপল্লির মধ্যে এক পানশালায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। সবাই স্তব্ধ, হতবাক ও আতঙ্কিত। সবাই তার নিজের নিজের সন্তানদের পাশে রেখে স্ত্রী স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু কী করে সেই কথা বলে! হাঃ হাঃ—আমি আমার যাত্রা শুরু করি তার দিকে। সব মানুষ আমার চোখ থেকে মুছে যায়। সে-ই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সৌন্দর্য ফেটে পড়ছে তার সত্তা থেকে।

অথচ দেবদাসের করুণ পরিণতিতে, তার মৃত্যুতে কত পাঠক যে চোখের জল ফেলেছে তার হিসেব কে জানে। দেবদাসের জন্য কান্না। ওয়াক্। আমার বমি পেয়েছে। অনেক মৃত গ্রন্থ পার হয়ে এসে হঠাৎ একদিন এক জীবন্ত গ্রন্থের দেখা পাই। পুতুল নাচের ইতিকথা—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দে আত্মহারা আমি। পাঠ্যবইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে আসি বাড়িতে। বইয়ের মলাটে চুমু খাই, তাকিয়ে থাকি মলাটের ছবিটির দিকে। খড়ের ঘর, কলাগাছের আভাস, আলিঙ্গনে আবদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ—সবার ওপরে ও ঊর্ধ্বে একটি বিশাল হাত। যে হাত ধরে আছে সমস্ত সুতোর শেষ প্রান্ত। যার আঙুলের নড়াচড়ায় সব পুতুল নাচে। মানুষ পুতুল। মা ভাত বেড়ে আমাকে ডাকে। আমি খাওয়া ভুলে যাই, বই নিয়ে বসি। হারু পরান আর গোপাল। গোপাল—সুদখোর, সংসারী ও সংকীর্ণ। কুসুম, মতি ও সেনদিদি। শশী আর কুমুদ। চরিত্রগুলি আমার কাছে জীবন্ত। ভাষা আমার কাছে স্বাভাবিক। অধ্যায়ের পর অধ্যায় যখন পড়ে যাই, মনে হয় না কোনো বই পড়ছি। আমি হাঁটছি জীবনের মধ্য দিয়ে। আমি পরপর ২৪ বার পড়ি ওই গ্রন্থ। কিন্তু অতৃপ্তি, কোথায় কাঁটা বিধে থাকে। রাত জেগে আমি ভাবি। যাদব আর যাদবের স্ত্রী'র দিকে আমি তাকিয়ে। আমি তাকিয়ে কুসুমের দিকেও। আহ্, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী চরিত্র, কুসুম, কপিলা ও আনন্দ। যারা কাচের স্বচ্ছ পাত্রের মধ্যে আটকা পড়া মাছি। যারা বেরিয়ে আসতে পারে না। কুসুমের রহস্যময়তা আমাকে বিরক্ত করে। শশীর নপুংসকতাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি চাই শশী ও কুসুমের সরাসরি সঙ্গম ও সহবাস। সরাসরি, তীব্র ও উন্মাদক। ওই গ্রন্থে যা আছে, সে কি তাহলে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে? লাথি মারো বাস্তবতাকে। আমি জানি তাকে। গোটা পুতুল নাচের ইতিকথা ধ্বংস করে দিয়েছে শশী, শশীর কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা ও নৈরাশ্য। পুতুল নাচের ইতিকথায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গোপাল, একমাত্র গোপালই। আর কেউ নয়। সে-ই পুরো লেখাটিকে বাঁচিয়েছে। সেই বয়সে আমি যে শশীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর গোপালকে সত্যি সত্যি মানিকের বাবা ভেবে বসেছিলাম, সেই ধারণার কথা আজ যখন ভাবি, হেসে ওঠার বদলে কেঁপে উঠি। কী নিষ্ঠুর ভাবেই না আমি জানতাম, যে কেউ, তার নিজের জীবনই লিখতে পারে, অন্য কারুর জীবন নয়। অন্য কারুর জীবন নয়।

আসলে সেই গ্রাম, গাওদিয়া, ধ্বংস হয়ে গেছে। মানিকের বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা ছিটকে পড়েছি সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকে। আমাদের চারপাশে এক বিশৃঙ্খলা। যে আবেগ, প্রেম ও মানবিকতার কথা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, আমি তার ধারা আমার আশপাশের মানুষগুলির মধ্যে লক্ষ করার জন্য আকুল হয়ে উঠেছি। আর নিজের বোকামিতে নিজেই হেসেছি। কেন্দ্রবিন্দুতে এক বালক, তার চারপাশে সেইসব 'পুতুল'। যাদের সুতোর শেষ প্রান্ত এক আফিম ও অর্থহীন শক্তির হাতে বাঁধা। আমি ঘৃণা করি। আমি ভালোবাসতে চাই। আমি যে ভালোবাসতে পারছি না, আমাকে যে ঘৃণা করতে হচ্ছে—এজন্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করি। যে রমণীটি গোপনে ব্যভিচার করে, তার স্বামী, সমাজ ও শৃঙ্খলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্‌টিয়ে হাসে, আমি তার কাছে ছুটে যাই। যে জুয়াড়ি নিজেকে ধ্বংস করছে, যে লম্পট ঝাঁপিয়ে পড়েছে উত্তাল জীবনে, যে অপরাধী জানে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ যে কুমারী যৌন সংকেতগুলি দু-পায়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় উলঙ্গ, 'প্রেম-ভালবাসার' ন্যাকামির দিকে থুতু ছিটিয়ে হেঁটে চলেছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। গেরস্থপল্লি থেকে গণিকাপল্লির

দিকে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু তারা কেউই আমাকে জানে না। আমার প্রয়োজন নাই তাদের। কী করছে তারা সেও জানতে চায় না, জানার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। শুধু তারা করে যায়। যত বাধা আসে, অত্যাচার, নির্যাতন ও 'পথে ফিরিয়ে নেওয়া'র যত কৌশল আসে, তত তারা মরিয়া হয়ে ওঠে, উন্মাদ হয়ে ওঠে। আরও বেশি করে আশ্রয় নেয় অন্ধকারের গর্ভে। ওরা মৃত্যুর দিকে ছুটে যায়। বেঁচে থাকার দিকে ছুটে যায়। ওদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না আমি। সেখানে প্রবেশ করার কোনো পথ নেই আসলে। ওরা নিজেকেই নিয়ে ব্যস্ত। আমি নিজেকে শূন্য ও স্বাভাবিক করে দাঁড় করিয়ে রাখি এই ভয়াবহ রাস্তার মোড়ে। কিন্তু ওরা এড়িয়ে যায় আমাকে। আমি স্পর্শ করতে চাই ওদের, ওরা ভ্রূক্ষেপ করে না। আমি আমার কাজ শুরু করি। আমি শব্দগুলি নিয়ে খেলতে শুরু করি, এক ভয়ংকর খেলা। আমি লাফিয়ে নেমে আসি আমার দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা অবস্থান থেকে। সমস্ত হতভাগ্য, পতিত ও অপরাধীরা যেখানে যাবে, সেই মূলবিন্দুতে আগেভাগেই ছুটে গিয়ে বসে থাকি। সে এক পৃথিবী...সেখানে আসবে সবাই, কিন্তু কেউই আমাকে চিনবে না, তার জন্য দুঃখ নাই আমার...

শব্দের মধ্যে ফিরে আসি, কবিতার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ থেকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত থেকে জীবনানন্দ দাশ। জীবনের সারাৎসার। শব্দের উত্তাল ঢেউ। ভাষার মধ্যে গোটা ব্রহ্মাণ্ড। সবকিছু আকারহীন ও নীহারিকার মতোই সক্রিয়। আমাকে কি এখানেই থাকতে হবে? গ্রন্থের মধ্যে একা? এই সৌন্দর্য আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে চায়, সৌন্দর্য, শব্দ ও ভাষা চায় মৃতদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিতে। একদিন, র‍্যাঁবোকে পেয়ে যাই আমি, ঠিক সেই ১৯ বছর বয়সে। কাঁধের ঝোলায়, র‍্যাঁবো ও জীবনানন্দ আমি চলেছি বেশ্যাপাড়ার দিকে, ভাটিখানার দিকে, গ্রাম্য মেলার দিকে, জুয়াড়ি, গেঁজেল ও মাতালদের দিকে। গ্রন্থ ও মানুষ। শব্দ ও মাংস। গান ও যৌনসঙ্গম। বিশুদ্ধ কবিতা ও যোনি থেকে বীর্যের গড়িয়ে যাওয়া ধারা। সাঙ্ঘারবাড়ি ও ভাটিখানায় বসে আমি র‍্যাঁবো পড়ি...বেশ্যার ঘরে জীবনানন্দ...জুয়ার আড্ডায় বসে ডস্টয়েভস্কি...

স্বপ্নের মধ্যে শুরু করি এক অন্তহীন উপন্যাস। স্বপ্নের মধ্যে শুরু করি এক দীর্ঘ কবিতা। যার জন্ম আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। যার শেষ আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো বা সেখানেও শেষ নয়। সমস্ত কিছু গোপন রাখি আমি। আমার চিন্তা, ভাবনা ও লেখা। আহ্, সেই শৈশবে, ছেলেবেলায় কী ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা ছিল আমার, নিজেকে গোপন রাখব সমস্ত মানুষের কাছে, দূরে সরে থাকব প্রকৃতি, পরিবার ও যৌনচক্র থেকে। আমি যাদের লক্ষ করি তারা আমাকে দেখে না। দেখতে পায় না। আমি যে মানুষদের জীবন পড়ি, তারা আমাকে ভুলেও একবর্ণ বোঝে না। আমি সবার নীচে, সেজন্যেই আমার চোখে ধরা পড়ে সবাই। ওরা আমাকে দেখতে পায় না। যে গ্রন্থ আমি পড়ি, সেই গ্রন্থেরও আমাকে পড়ার ক্ষমতা নাই। জড়ের মধ্য দিয়ে প্রাণ প্রবাহ। যে কবি ও লেখকের লেখা পড়ে তার জীবনের কথা ভেবে, তার দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি উন্মাদ, সেই কবি বা লেখক আমাকে জানে না। আমি অপরিচিত তাদের কাছে।

আমার অবস্থান গোপনে। আমার উল্লাস আমাকে ঘিরেই...

সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে, প্রথম বেশ্যার ঘরে রাত্রি কাটাবার সময় আমি আমার জীবন সত্যকে বিস্ফারিত চোখে আবিষ্কার করি। সঙ্গম-ক্লান্ত মেয়েটি আমার দিকে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। এক নগ্ন ঘুম। সমুদ্রের তলায় তার উলঙ্গ শরীর। সারা ঘরে আলো জ্বলে যাচ্ছে। বীভৎস শব্দে ঘুরে চলেছে সিলিং থেকে পাখা। হা খোলা বাথরুম। দেয়ালে ক্যালেন্ডারগুলির পাখসাট। আমি সম্পূর্ণ একা। সেই অপরিচিত মাগিটির ভয় নেই আমাকে। নির্ভয়ে সে ঘুমায়। আমি জানি আমার কথা মনেও ছিল না তার। আমি তার কাছে, 'যে কেউ'। আমি তার পাশ থেকে উঠে মেঝের উপর দাঁড়াই, উলঙ্গ। মেঝের উপর পায়চারি করি আমি। বাথরুমে যাই, বেরিয়ে আসি। আয়নার সামনে দাঁড়াই ও অদ্ভুতভাবে হাসি। সিগারেট ধরাই। ল্যাংটা মানুষের সিগারেট টানা, আহ্। না, আমি আমার চিরসঙ্গী গ্রন্থের দিকেও হাত বাড়াইনি সেই রাত্রিতে। আমি ভাবতে পারিনি আমার চারপাশের উন্মাদের কথাও, জীবন উন্মাদ। শুধু দেখি নিজেকে। আমিই এক জীবন্ত মহাগ্রন্থ, মহামানুষ। কিংবা অশ্লীল একটি শব্দ মাত্র। কিংবা একটি ভ্রূণ মাত্র। বেশ্যার ঘরের সেই রাত্রি থেকে আমি সংকেত পাঠাই অন্য এক রাত্রিতে। এক অরুণেশের কাছ থেকে অন্য অরুণেশকে...। পড়তে শুরু করি নিজেকে...।

১৯৭০

বাংলাপ্ল্যাকর্ড